সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বাংলাদেশে ভারতের নতুন হাই কমিশনার

১. ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ আইসিসিআর কোলকাতায় গ্যানজেস আর্ট গ্যালারি আয়োজিত শিল্পী শাহাবুদ্দিনের চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ২. ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ্যপাল শ্রী তথাগত রায়ের সাক্ষাৎ ॥ ৩. ১২ জানুয়ারি ২০১৬ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভারত মহাসাগর নৌ সিম্পোজিয়ামে আগত ভারতীয় নৌবাহিনি প্রধান এডমিরাল রবিন ধওয়ানের সাক্ষাৎ ॥ ৪. ১০ জানুয়ারি ২০১৬ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ত্রিপুরার শক্তি উন্নয়ন, পল্লী উন্নয়ন ও পরিবহন মন্ত্রী মানিক দের সাক্ষাৎ ॥ ৫. ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের ১৯৭১ সালের যুদ্ধের বিজয় স্মারকে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ॥ ৬. ঢাকায় ভারতের পল্লী উন্নয়ন, পঞ্চায়েতী রাজ, পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রী চৌধুরী বীরেন্দর সিং ॥ ৭. ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫ কুষ্টিয়ায় নিহত ভারতীয় সৈন্যদের স্মৃতিসৌধ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার রাজ্যপাল শ্রী তথাগত রায় ॥ ৮. ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ উত্তরায় আইভিএসি-র নতুন কেন্দ্রের উদ্বোধন

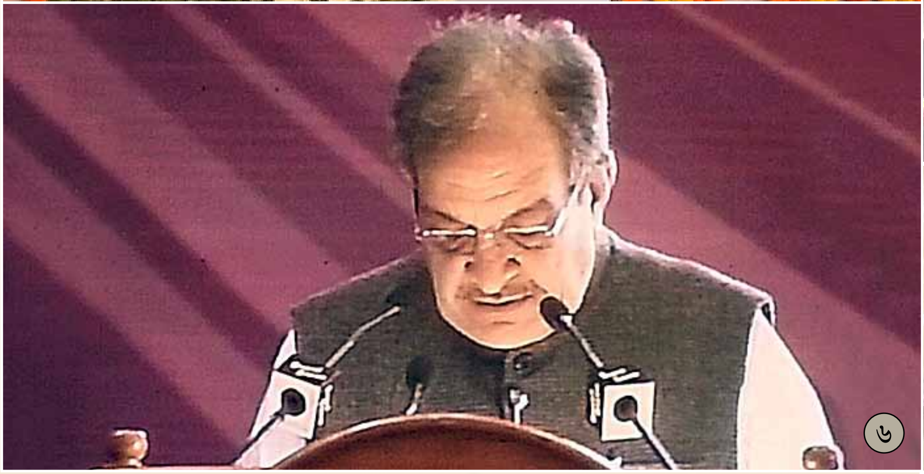

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ চুয়াল্লিশ | সংখ্যা ০১ | অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৪২২ | জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৬

www.hcidhaka.gov.in
Facebook page: /IndiaInBangladesh; @ihcdhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

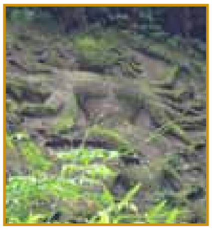

ভ্রমণকাহিনি:
প্রাণের দোসর আগরতলা
পৃষ্ঠা: ৪২

সূ চি প ত্র

পরিচিতি শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা : বাংলাদেশে নতুন হাই কমিশনার ০৪
শ্রদ্ধাঞ্জলি লেফটেন্যান্ট জেনারেল জ্যাকব ॥ বাংলাদেশের বন্ধু ০৫
উন্নয়ন মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগ ০৬
সৌহার্দ দশম বিশ্ব হিন্দি সম্মেলন ॥ অঞ্জয়রঞ্জন দাস ০৭
প্রজাতন্ত্র দিবসে হাই কমিশনার ০৮
ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ॥ ৩১
নিবন্ধ এসেছ জ্যোতির্ময়... ॥ ড. মোহাম্মদ সেলিম ১০
প্রবন্ধ ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানী ॥ তপন চক্রবর্তী ১৫
সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কবি মধুসূদন ॥ ড. ফেরদৌসী হক ৩২
শুভেচ্ছা জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥ মাসুদ করিম ১৯
ছোটগল্প যোদ্ধা ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ২০
অপেক্ষা ॥ মঞ্জু সরকার ॥ ৪৫
কবিতা মুহম্মদ নূরুল হুদা ॥ কবির-আল চপল ২৪
শিকওয়া নাজনীন ॥ খালেদ রাহী ॥ ইলিয়াস বাবর ২৫
ধারাবাহিক রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা ॥ সালেহা চৌধুরী ৩৮
বিগফুট কি সত্যিই আছে? ॥ নাসরীন মুস্তাফা ২৬
উদ্‌যাপন প্রবাসী ভারতীয় দিবস ২০১৬ ঢাকা ২৯
ভ্রমণ প্রাণের দোসর আগরতলা ॥ হাবিবুর রহমান স্বপন ৪২
শেষ পাতা বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল ॥ আবুল ফজল পাইলট ৪৮

১০

এসেছ জ্যোতির্ময়...

অদ্ভুত এক আঁধার নেমেছিল এই দেশে, কিন্তু সাহিত্য, মননশীলতা, মানবিকতা, সভ্যতার মূল্যবোধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সব বেদখল হয়ে যায়। বন্দুকের নলের কাছে অনেকে বশ্যতা স্বীকার করল। স্বৈরাচারীচক্র পুলকিত হল কিন্তু ইউনিফর্মধারীরা তারপরও স্বস্তি পায় না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করেও খুনিচক্র তাদের অবৈধ ক্ষমতা দখলকে নিরঙ্কুশ করতে পারেনি। চক্রান্তকারীদের ভয় বঙ্গবন্ধুকে। গণমাধ্যমসহ সরকারি প্রচার মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু' নিষিদ্ধ করা হল।

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মোঃ রেদওয়ানুর রহমান

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

মুদ্রণ ডটনেট লিমিটেড
৫১/৫১এ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৬২১৯৮

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

প্রাপ্তির অনুরোধ

আমি একজন স্কুল শিক্ষক। ফরিদপুর জেলা সদর থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে আমাদের স্কুলটি অবস্থিত। স্কুলটি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর আমাদের বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাঠ সমাপ্ত করে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চতর শিক্ষালাভে ব্রতী হয়েছে।

আমাদের বিদ্যালয়ে একটি পাঠাগার আছে। সেখানে উৎসাহী শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার জন্য দেশী-বিদেশী লেখক-লেখিকাদের বই এবং কতিপয় ম্যাগাজিন সংরক্ষিত রয়েছে। জানতে পেলাম, আপনাদের দূতাবাস থেকে *ভারত বিচিত্রা* নামে একটি আকর্ষণীয় মাসিক সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে তা বিনামূল্যে প্রেরণ করা হয়। আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠাগারের জন্য আমরা উক্ত পত্রিকা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক।

আমাদের স্কুলের ঠিকানায় দুই কপি করে *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

মো. নুরুল আমিন মিয়া
শুভরামপুর হাই স্কুল, আম্বিকাপুর
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর

একমাত্র জিজ্ঞাসা

আমার কবিবন্ধু ও *পদক্ষেপ*-এর সম্পাদক জ্যোতির্ময় দাশ আপনাদের মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* পাঠিয়ে আমাকে আনন্দিত করেছেন। সেই সঙ্গে পেয়েছি সম্মান দক্ষিণা। এরকম একটা উন্নত পত্রিকা বাস্তবিকই ভারত ও বাংলাদেশের মানুষদের মধ্যে সম্প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধন জোগাচ্ছে এতে আর আশ্চর্যের কি! তবে আমি কী করে এই পত্রিকা দিল্লিতে পেতে পারি সেটাই এখন আমার একমাত্র জিজ্ঞাসা। আপনি কি আমার নামটা আপনাদের মেইলিং লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারবেন?

আপনার সম্পাদকীয় বর্ষার এই দিনে পড়ে বুঝলাম আপনি শুধু যে বাংলায় ও ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখেন তাই নয়, আপনি একজন কবি। যদি কবিতা না লেখেন তাহলেও বলব, প্রকৃতির বর্ণনা যে এভাবে দিতে পারে তার ভেতর কবিতার ঝর্নাধারা বইছে, একটু তাকিয়ে দেখার অপেক্ষা।

আমি মূলত ঔপন্যাসিক, সারা জীবনের চেষ্টায় আমি ১৮খানা উপন্যাস লিখেছি। তার মধ্যে নিরন্ন (তিন খণ্ডে) দেশবিভাগ নিয়ে। দশ বছর রিসার্চের ফল, সফল কিনা জানি না, তবে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় review করেছেন, বলেছেন এ বইয়ে আছে যেমন art তেমন learning। তৃতীয় খণ্ড বাংলাদেশকে নিয়ে কারণ আমার প্রবীণ নায়ক বাংলাদেশের মাটি আঁকড়ে পড়ে ছিলেন স্বাধীনতার পরে। আমি বেশ কিছু প্রবন্ধও লিখেছি। তিনটি প্রবন্ধ পাঠালাম, পড়ে দেখবেন– মনোনীত হলে ছাপাবেন।

অদিত্য সেন
যুগ্ম সম্পাদক, উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস
জে-১৮৬৯, সি আর পার্ক, নতুন দিল্লি-১৯

ক্ষণিকের জন্য

ভারত বিচিত্রার সঙ্গে আমার নাড়ির বন্ধন প্রায় সাড়ে তিন দশকের। তখন একে পেয়েছিলাম নিত্যদিনের সঙ্গী হিসেবে। দেখেছি, দীর্ঘ এই দশকগুলোতে হাতবদল হয়েছে সম্পাদকের। দেখেছি, তার কলেবর বৃদ্ধিসহ কাগজের মানোন্নয়ন। সেই সময় *ভারত বিচিত্রায়* সিনেমা, ফিচার, তীর্থস্থানের ছবিসহ ভ্রমণকাহিনি, ক্রিকেট-ফুটবলের সময়োপযোগী টুকরো খবর, আধুনিক ভারতের বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা খুঁজে পেতাম। তার অনেক কিছুই আজ অনুপস্থিত। এগুলোকে আবার ফিরিয়ে আনা যায় কি না?

তখন গ্রাহক তালিকায় নাম থাকায় নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* পেতাম। আমার সংগ্রহশালায় তা সংরক্ষিত আছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে। আমার দু'কন্যার মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তারা *ভারত বিচিত্রার* সংগ্রহে মহা খুশি। তারা মনের অজান্তে *ভারত বিচিত্রা* নাড়াচাড়া করতে করতে হয়ে উঠেছে কৌতূহলী পাঠিকা। তারাও আমার মত পত্র-পত্রিকা পড়ায় আগ্রহী। আমি নিজেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করি। আমার মেয়েরাও আমার মত লেখালেখিতে পারদর্শী। সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাদের লেখা বের হয়। *ভারত বিচিত্রা* এমন একটি পত্রিকা যা পড়লে ভারতের একটা জীবন্ত চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আয়নার মত প্রতিফলন

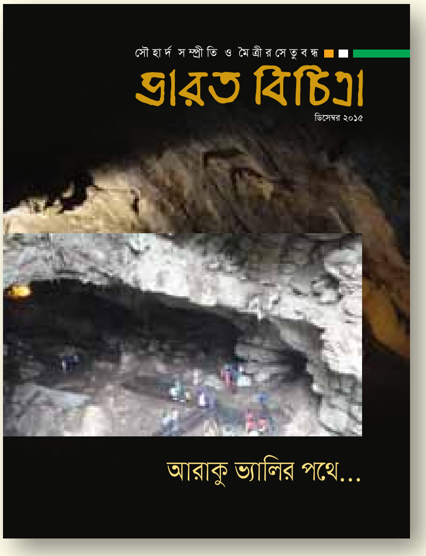

দেখি *ভারত বিচিত্রার* মত মাসিক পত্রিকার। দুঃখের বিষয়, ব্যক্তি নামে পত্রিকা পাঠানো হবে না বলে ঘোষণা দেওয়ার পর গ্রাহক তালিকা থেকে আমার নাম বাদ পড়েছে। সেই থেকে আমার সংগ্রহশালা শূন্য পড়ে আছে। শিক্ষকতার সূত্রে স্কুলে বসে ক্ষণিকের জন্যে এক নজর দেখা হয় মাত্র *ভারত বিচিত্রার* সঙ্গে। শিক্ষকদের হাতে হাতে ফেরে পত্রিকাটি। শিক্ষকতার জীবন থেকে 'অবসর' নামে একটা নিয়ম আমার সামনে ঝুলছে। তাই এক নজর দেখার যে সুযোগ পাচ্ছিলাম, সেটাও আগামী দিনগুলোতে বন্ধ হয়ে যাবে। এপ্রিল ২০১৫ সংখ্যায় নতুন গ্রাহক তালিকা প্রস্তুতের ঘোষণা দেখলাম। নতুন গ্রাহক তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করে আমাকে ও আমার মেয়েদের পড়ার সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

চিত্তরঞ্জন মল্লিক
গ্রাম: হোগলবুনিয়া, ডাকঘর: বটিয়াঘাটা
খুলনা-৯২৬০

সরিষা ফুলের শুভেচ্ছা

আমাদের বড়াল নদীর পাড়ের জমিতে ফুটে থাকা হলুদ সরিষা ফুলের শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। আশা করি সবার মাঝে সবার সাথে বেশ ভাল আছেন। ভাইয়া গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে *ভারত বিচিত্রা* জুলাই ও আগস্ট পত্রিকা দুটি পেলাম। দারুন লাগল হাতে পেয়ে। এর পেছনে যাঁরা আছেন তাঁদের সবাইকে বনলতা বেতার শ্রোতা সংঘের পক্ষ থেকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা।

জাকির হোসেন রাজু
বনলতা বেতার শ্রোতা সংঘ
চরগোবিন্দপুর, জোনাইল, বড়াইগ্রাম, নাটোর

কুয়াশার চাদর ভেদ করে ভোরের আলো এসে পড়ল গাছ-গাছালির মাথার ওপর দিয়ে। চারিদিক ক্রমে জেগে উঠতে লাগল। সবার আগে জাগল পাখপাখালি। কী যে কলকলানি তাদের! একটি পাখি প্রথমে ডেকে উঠল– বোধহয় মা-পাখি। ছানাদের ডাকল। বলল বোধহয়– আমি বাইরে যাচ্ছি খাবারের সন্ধানে, তোরা যেন বেরুসনি! তারপর অন্যান্য পাখি। ক্রমে কোলাহলে পূর্ণ হয়ে উঠল বনস্থলি। কত আগে আমাদের এক কবি লিখেছিলেন, 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুমকলি সকলে ফুটিল।' তারপর পুবের আকাশ লাল হয়ে উঠল। যেন তরল সোনার প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মন যেন গেয়ে উঠল, 'ওঠ ওঠ সুরজাইরে ঝিকিমিকি দিয়া, কালকে তুমি আঁধার রাতে কোথায় ছিলে গিয়া।' হ্যাঁ, ভোরের আলোয় জবাকুসুমের মত মহাদ্যুতিময় সূর্যের আবির্ভাব ঘটল তিমিরসাগরের পরপারে।

প্রতিদিনের মত একটি সকাল ১ জানুয়ারি ২০১৬। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি দিনের, একটি নতুন বছরের জন্ম হল মহাকালের গর্ভে। *ভারত বিচিত্রা* পদার্পণ করল এক নতুন বছরে। তার বয়স হল চুয়াল্লিশ। একটি পত্রিকার জন্যে এটি বেশ দীর্ঘ সময়। এই মুহূর্তে ভারত বিচিত্রা দেশের প্রাচীনতম সাময়িক পত্র। এর অগণিত পাঠক, শুভানুধ্যায়ী, অনুগ্রাহী আর বিজ্ঞাপনদাতাকে জানাই ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা। জয়তু ২০১৬।

নতুন বছরে একটি সুসংবাদ দেবার আছে আমাদের তরফ থেকে। বাংলাদেশে ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত হয়ে এসেছেন শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। সুদীর্ঘ ৩২ বছরের কূটনৈতিক জীবনে তিনি ভারতে এবং ভারতের বাইরে প্যারিস, হ্যানয়, তেল আভিভ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও জাতিসংঘে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন। বাংলাদেশে তাঁর কর্মজীবন সাফল্যমণ্ডিত হোক এই প্রার্থনা।

জন্ম-মৃত্যু চিরন্তন। এই জানুয়ারিতে একাশি বছরে পা রাখলেন আমাদের অতি প্রিয় অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এটা যেমন সুখবর, তেমনি একটি দুঃসংবাদও দেবার আছে। বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু, মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনির পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অফ স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন। তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বাংলাদেশ দ্রুততম সময়ে স্বাধীনতা লাভ করে; প্রায় ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে জেনারেল নিয়াজি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করেন। এ মাসেরই ৩০ জানুয়ারি দিল্লিতে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান মহাত্মা গান্ধী, এক সান্ধ্যকালীন প্রার্থনাসভায়। জাতির পিতার এই মর্মান্তিক মৃত্যুর দিনটি ভারতের শহিদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত। বাপুজীকে আমরা ভুলিনি। এই দিনে শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করার শপথ থাকে ভারতবাসীর।

বাংলার রেনেসাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল, বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান বিদ্রোহী মাইকেল মধুসুধন দত্তের জন্মও এই মাসে, ১৮২৪ সালে। এ মাসে জন্মেছিলেন বাংলার রেনেসাঁর আরেক সার্থক ফসল, ভারতের অধ্যাত্মজগতের অন্যতম দিকপাল স্বামী বিবেকানন্দ।

জানুয়ারির ১০ তারিখ বাংলার মানুষের জন্য ঐতিহাসিক একটি দিন। এ দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যুক্তরাজ্য-ভারত হয়ে বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ চূড়ান্ত বিজয়ের পর তাঁকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানানোর জন্য গোটা জাতি অপেক্ষা করছিল। দীর্ঘ ৯ মাসের সংগ্রাম ও এক সাগর রক্তের দামে কেনা স্বাধীন দেশে তাঁর আগমন ছিল জ্যোতির্ময় পুরুষের মত। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারই হোক জয়।' তাঁর আগমন ছিল অন্ধকারের ভিতর থেকে উৎসারিত আলোর মত।

পরিচিতি

শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

বাংলাদেশে ভারতের নতুন হাই কমিশনার

সুদীর্ঘ ৩২ বছরের কূটনৈতিক জীবনে শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা দিল্লি এবং ভারতের বাইরে প্যারিস, হ্যানয় ও তেল আভিভে ভারতীয় মিশনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি নিউইয়র্কের জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী মিশনে মিনিস্টার/কাউন্সেলর এবং ভিয়েতনামের হোচি মিন সিটি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে কনসাল জেনারেল হিসেবেও দায়িত্বপালন করেন। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি বাংলাদেশে আসার প্রাক্কালে তিনি থাইল্যান্ডে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

শ্রী শ্রিংলা বিদেশ মন্ত্রকের বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মিয়ানমার ও মালদ্বীপ অঞ্চলের যুগ্ম-সচিব (মহাপরিচালক) হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। তিনি বিদেশ মন্ত্রকের জাতিসংঘের রাজনৈতিক এবং সার্ক বিভাগের প্রধান ছিলেন। এর আগে তিনি উত্তরাঞ্চল (নেপাল ও ভূটান) বিভাগের পরিচালক ও ইউরোপ পশ্চিম বিভাগের উপ-সচিব হিসেবে দায়িত্বপালন করেন।

শ্রী শ্রিংলা দিল্লির সেন্ট স্টিফেন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর বিদেশ মন্ত্রকে যোগদানের আগে বিভিন্ন কর্পোরেট ও সরকারি বিভাগে কাজ করেন। তিনি নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহুমুখী কূটনীতি ও দ্বন্দ্ব রোধ (multilateral diplomacy and conflict prevention) বিষয়ে অধ্যয়ন করেন এবং এ বিষয়ে তাঁর একটি আন্তর্জাতিক প্রকাশনা রয়েছে। তিনি অর্থনৈতিক কূটনীতি ও প্রবাসী ভারতীয়দের বৈচিত্র্য বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

শ্রী শ্রিংলা ইংরেজি ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ছাড়াও ফরাসি, ভিয়েতনামিজ এবং নেপালিজ ভাষায় কথা বলতে পারেন। তিনি শ্রীমতী হেমল স্টোর শ্রিংলার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের এক পুত্র সন্তান রয়েছে।

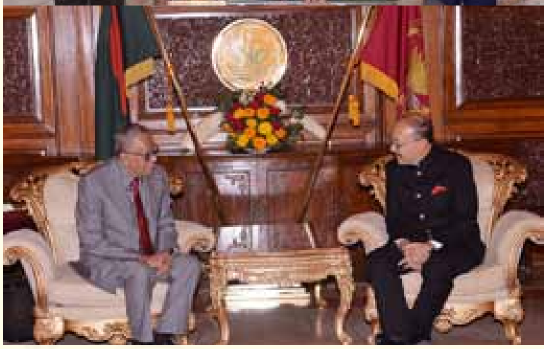

লে. জে. জ্যাকব

বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু

জ্যাকব ফার্জ রাফায়েল জ্যাকব (জে এফ আর)-এর জন্ম ১৯২৩ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষের কলকাতায়। লে. জেনারেল জ্যাকব নামে সমধিক পরিচিত বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী এই ভারতীয় সেনানায়কের পূর্ব-পুরুষেরা অষ্টাদশ শতকে বাগদাদ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁরা ছিলেন ইহুদি ধর্মাবলম্বী। জ্যাকবের পিতা ইলিয়াস ইমানুয়েল ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। শৈশবে অসুস্থ হয়ে পড়লে জ্যাকবের পিতা ৯ বছর বয়সে তাঁকে দার্জিলিংয়ের নিকটবর্তী কার্শিয়াংয়ের ভিক্টোরিয়া বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে পরিবারের সঙ্গে তাঁর একটা দূরত্বের সৃষ্টি হয়। তিনি কেবল বন্ধের দিনগুলোতেই পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জ্যাকব হলোকস্ট (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের উপর চালানো গণহত্যা)-এর নির্মমতা দেখে পিতার আপত্তি সত্ত্বেও ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনিতে যোগদান করেন। ২০১২ সালে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'আমি গর্বিত আমি ইহুদি, তার থেকেও বেশি ও অনেক বেশি গর্বিত যে আমি ভারতীয়।'

১৯৭১ সালে জ্যাকব ভারতীয় সেনাবাহিনির পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অফ স্টাফ নিযুক্ত হন। এই দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনি পরাজয় বরণ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি প্রশংসাসূচক অনেক সম্মান লাভ করেন। ১৯৭১ সালের মার্চে পাকিস্তানী হানাদারবাহিনির অপারেশন সার্চলাইট-এর বিভীষিকায় লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণভয়ে ভারতে আশ্রয় লাভের জন্য আসতে থাকে। চিফ অফ স্টাফ জ্যাকব এ সমস্যা নিরসনের উপায় খুঁজতে থাকেন। পাকিস্তানীদের অত্যাচার ক্রমে আরও বাড়তে থাকলে তিনি তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন যে, এ সমস্যা নিরসনের একমাত্র উপায় হচ্ছে পাকিস্তানীদের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনির প্রধান শ্যাম মানেকশ' পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডকে প্রথমেই চট্টগ্রাম এবং খুলনা শহর দখল করার নির্দেশ দেন। জাতিসংঘ এবং চিনের প্রবল চাপের মুখে ভারতীয় সেনাবাহিনির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় আপত্তি জানাচ্ছিলেন। কিন্তু জ্যাকব সব ধরনের চাপের উর্ধ্বে গিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে উদ্যোগী হন। প্রথমেই তিনি ঢাকাকে দখলমুক্ত করার পরিকল্পনা করেন এবং সুচারুভাবে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অগ্রসর হন। তাঁর পরিকল্পনা অবশেষে সফল হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনি পাকিস্তানীদের ঢাকা থেকে হটাতে সফল হয়। ঢাকা দখলের পর তিনি পাকিস্তানী সেনাবাহিনির সকল যোগাযোগমাধ্যম ধ্বংস করে দেন। তিনি তিন সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা দখলের পরিকল্পনা করেন, কিন্তু তা হয়ে যায় এক রাতের মধ্যেই। তারপর আরো অনেক স্থান দখল করতে সক্ষম হয় ভারতীয় সেনাবাহিনি। জ্যাকব বুঝতে পারেন যে, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় নিশ্চিত করা যাবে না। তাই তিনি জেনারেল নিয়াজির কাছে আত্মসমর্পণের খসড়া পাঠিয়ে দিয়ে তাঁকে পাকিস্তান সেনাবাহিনিসহ ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করতে বলেন। ওইদিন সকালে জ্যাকব শ্যাম মানেকশ'র ফোন পান। ভারতীয় জেনারেল তাঁকে ঢাকায় গিয়ে আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি নিতে বলেন। তারপর তিনি আত্মসমর্পণের দলিল হাতে নিয়ে ঢাকায় পৌছন এবং পাকিস্তানী বাহিনির আত্মসমর্পণের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠান পরিচালনায় তিনি জেনারেল নাগরাকে দুটি চেয়ার ও একটি টেবিল জোগাড় করতে এবং একটি যৌথ গার্ড অফ অনারের আয়োজন করতে বলেন। তারপর পাকিস্তানীবাহিনি রাজধানী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৩০ মিনিটের মধ্যে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে।

নিয়াজি পরবর্তীকালে দাবি করেন যে, জ্যাকব তাঁকে ব্লাকমেইল করে আত্মসমর্পণে রাজি করিয়েছিলেন। ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়ে নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেন। এখানে আরেকটি বড় ব্যাপার হচ্ছে, ঢাকায় তখন প্রায় ৩০ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য উপস্থিত ছিল, অপরদিকে ভারতীয় সৈন্য ছিল মাত্র ৩ হাজার। অর্থাৎ অনুপাতে ১০:১। এক্ষেত্রে জ্যাকব অনেক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। জেনারেল নিয়াজি এ সম্পর্কে মোটেই অবগত ছিলেন না।

ভারতীয় সমাজে গ্রহণযোগ্য সামরিক নির্দেশনা দিয়ে এই ভারতীয় বীর সাফল্যের তাঁর সঙ্গে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। ৩৭ বছর সেবাদানের পর ১৯৭৮ সালে তিনি সামরিকবাহিনি থেকে অবসর নেন।

ব্যবসায় জগতে প্রবেশের পর ১৯৯০-এর দশকের শেষদিকে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন। তিনি অনেক বছর নিরাপত্তা পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রথমে গোয়া ও পরবর্তীকালে পঞ্জাবের গভর্নর হন।

দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ১৩ জানুয়ারি ২০১৬ নতুন দিল্লির সেনা গবেষণা ও রেফারেল হাসপাতালে তাঁর দেহাবসান ঘটে। বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল জ্যাকব দু'টি বই লিখেছেন। এগুলি হচ্ছে: ১. সারেন্ডার ইন ঢাকা, বার্থ অফ এ ন্যাশন; ২. এ্যান ওডেসি অফ ওয়ার এন্ড পিস: আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ জে এফ আর জ্যাকব।

• নিজস্ব প্রতিবেদন

উন্নয়ন

মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগ

'আসুন, ভারতে তৈরি করুন!' মুমূর্ষু উৎপাদনখাতের পুনরুজ্জীবনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আগ্রাসী প্রচেষ্টা ইন্ডিয়া ইনকর্পোরেটেড এক-জানলামুখী ছাড়পত্র, ন্যূনতম প্রক্রিয়া ও লালফিতার দৌরাত্ম্য কমানোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ– প্রধানমন্ত্রী মোদী 'মেক ইন ইন্ডিয়া' (ভারতে তৈরি করুন)-কে কর্মসংস্থান, প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ গতিসঞ্চার হিসেবে দেখছেন।

'মেক ইন ইন্ডিয়া'কে উৎপাদনখাতে ভারতের পুনর্নবায়িত গুরুত্বদানের অংশ হিসেবে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক পরিসরে উপস্থাপন করা হয়। এ উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতকে সবচেয়ে পছন্দের বৈশ্বিক উৎপাদনশীল ঠিকানা হিসেবে তুলে ধরা।

এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের পর থেকে ভারত সরকার উৎপাদন, নকশা, উদ্ভাবন ও আরম্ভের ক্ষেত্রে গতিবেগ সঞ্চারের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ভারত বিশ্বব্যাপী দ্রুততম প্রবৃদ্ধিশীল অর্থনীতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ভারতের প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী অবনত অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রবৃদ্ধির মরুদ্যান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া', 'একশো স্মার্ট শহর' এবং 'স্কিল ইন্ডিয়া'-র মত বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার করেছেন।

'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতকে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা। এটি ভারতীয় কোম্পানিসমূহের উৎকর্ষতাকে বৈশ্বিক কর্মজগতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা।

ভারত বড় পরিসরে তার অর্থনীতি উন্মুক্ত করেছে। প্রতিরক্ষা, রেলওয়ে, নির্মাণ, বীমা, অবসর ফান্ড, চিকিৎসা সরঞ্জামের মত সবই এখন সরাসরি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ভারত এখন বিশ্বের অন্যতম উদার অর্থনীতির দেশ।

এটি অর্জন করতে ভারত সরকার সহজে ব্যবসা করার ক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য অনেকগুলি পদক্ষেপ নিয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে– ব্যবসায় সম্প্রসারণে সরল ও সহজ বিধিবদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি। ভারত বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগ রক্ষায় প্রযুক্তিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছে। সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে ছাড়পত্র পেতে একমাত্র পোর্টাল হিসেবে ই-বিজ পোর্টালে ১৪টি সার্ভিস সমন্বিত করা হয়েছে।

'মেক ইন ইন্ডিয়া' ইতোমধ্যে উন্নত ব্যবসায়িক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে:

- ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে প্রথম
- বিশ্বের দ্রুততম প্রবৃদ্ধিশীল অর্থনীতির মধ্যে প্রথম
- প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন ও নেতৃত্বের সূচকে একশো দেশের মধ্যে প্রথম
- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ১১৩টি বিনিয়োগ গন্তব্যের মধ্যে প্রথম
- বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান জাতীয় ব্র্যান্ডের মধ্যে সপ্তম
- বিশ্ব ব্যাংকের তালিকায় ২০১৬-র সবচেয়ে সহজে ব্যবসা করার দেশের তালিকায় ভারত ১২ ধাপ এগিয়ে
- ২০১৫-১৬ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সূচকে ভারতের অবস্থান এখন ১৬

এ পর্যন্ত 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র কয়েকটি সাফল্যের কাহিনি

রেলওয়ে মন্ত্রণালয় বিহারের মাধেপুরা ও মারহাউরায় লোকোমোটিভ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কোম্পানি আলস্টোম বিএসই এবং জিই ট্রান্সপোর্টের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

ইলেক্ট্রনিক্স

- ফক্সকোন ভারতে ১০-১২টি সেবা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে
- অপ্পো, জেডটিই, ফিকোম ভারতে বিনিয়োগ করছে
- ওয়ান প্লাস, এএসইউএস মোবাইল তৈরির ঘোষণা দিয়েছে

অটোমোবাইল

- মার্সেডিজ বেঞ্জ ভারতে বিনিয়োগ করছে
- বিএমডব্লিউ ৫০ শতাংশ স্থানীয় জনবল বৃদ্ধি করেছে
- ভোলভো, ফোর্ড এসেছে আর এন্ড ডি সেবা নিয়ে

প্রতিরক্ষা

- হুন্দাই যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করবে
- সান গ্রুপ তৈরি করবে রাশিয়ান হেলিকপ্টার
- রিলায়েন্স ও তার আন্তর্জাতিক অংশীদাররা তৈরি করবে পারমাণবিক সাবমেরিন এবং গোয়েন্দা যুদ্ধ জাহাজ

বিমান চলাচল

- ভারত থেকে এয়ারবাস রপ্তানি বাড়বে দুশো কোটি ডলারের
- প্রাট ও হুইটনি 'মেক ইন ইন্ডিয়া'য় গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে

'মেক ইন ইন্ডিয়া' শ্লোগান একটি কার্যকর কৌশলে পরিণত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র উদ্যোগে গতিবেগ সঞ্চারের জন্য ভারত সরকার ২০১৬ সালের ১৩-১৮ ফেব্রুয়ারি 'মেক ইন ইন্ডিয়া সপ্তাহ' নামে মুম্বাইয়ে একটি বিশেষ ইভেন্টের আয়োজন করে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এর উদ্বোধন করেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদক

দশম বিশ্ব হিন্দি সম্মেলন

অঞ্জয়রঞ্জন দাস

১০-১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ভারতের মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে দশম বিশ্ব হিন্দি সম্মেলন আয়োজন করা হয়। স্থানীয় লাল প্যারেড গ্রাউন্ডে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর ৩৯টি দেশের প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ভোপাল শহরকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করা হয়। মূল প্রবেশপথ পঞ্চতত্ত্ব (অগ্নি, জল, বায়ু, পৃথিবী ও আকাশ)-এর আধারে নির্মিত সম্মেলনস্থলের নাম দেওয়া হয়েছিল মাখনলাল চতুর্বেদী নগর। সম্মেলনস্থলে রামধারী সিং দিনকর, রুনাল্ড স্টুয়ার্ট ম্যাকগ্রেগর, আলেক্সেই পেত্রভিচ বরান্নিকুব, বিদ্যানিবাস মিত্র, রাজেন্দ্র মাথুর এবং কবি প্রদীপ সভাকক্ষ নামে ছয়টি সভাকক্ষ ছিল। এছাড়া, ডা. মটুরি সত্যনারায়ণ, সমদত্ত বখুরি এবং হিন্দি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নামে তিনটি প্রদর্শনী কক্ষ ছিল। প্রদর্শনী কক্ষগুলোতে মধ্যপ্রদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, দর্শনীয় স্থান এবং ভারতবর্ষের কবি ও সাহিত্যিকদের বর্ণনা ছিল। সম্মেলনস্থলে মহাদেবী বর্মা সংবাদকক্ষ, দুষ্মন্তকুমার ভোজন কক্ষ, কাকাসাহেব কালেলকর ভোজন কক্ষ এবং সুভদ্রা কুমারী চৌহান স্বাগতম কক্ষ ছিল।

১০ সেপ্টেম্বর সকালে রামধারী সিং দিনকর সভাকক্ষে বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, পররাষ্ট্র রাজ্যমন্ত্রী জেনারেল (অবঃ) ড. বিজয়কুমার সিং, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস, যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ, বিজ্ঞানমন্ত্রী ড. হর্ষবর্ধন, স্বরাষ্ট্র রাজ্যমন্ত্রী কিরণ রিজিজু, মরিশাসের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী লীলাদেবী দুখন লচমন, মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল রামনরেশ যাদব, গোয়ার রাজ্যপাল শ্রীমতী মৃদুলা সিনহা, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, সাংসদ শ্রী অনিলমাধব, পররাষ্ট্র সচিব শ্রী অনিল বাধবা প্রমুখ। ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর চারটি সভাকক্ষে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সমান্তরালভাবে দেশ-বিদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা ১২টি বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিষয়গুলি হচ্ছে: গিরমিটিয়া দেশসমূহে হিন্দি, বিদেশে হিন্দি শিক্ষা, বিদেশিদের জন্য ভারতে হিন্দি অধ্যয়নের সুবিধা, অন্য ভাষা-ভাষী রাজ্যগুলোতে হিন্দি, বিদেশনীতিতে হিন্দি, প্রশাসনে হিন্দি, বিজ্ঞানে হিন্দি, যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিতে হিন্দি, আইন-আদালতে হিন্দি, শিশুসাহিত্যে হিন্দি, হিন্দি পত্রপত্রিকা এবং টেলিভিশনে হিন্দি ভাষার শুদ্ধতা এবং দেশ-বিদেশে প্রকাশনা সমস্যা এবং সমাধান।

১০ সেপ্টেম্বর বিকেলে প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রীয় মানব সংগ্রহালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অসমের বিহু নৃত্য, কাশ্মীরের রুফ নৃত্য, গুজরাটের সিদ্দিগউমা নৃত্য, কেরালার কলারিপট্টু নৃত্য, এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার মহিষাসুর বধ নৃত্য প্রতিনিধিদের মুগ্ধ করে। ১১ সেপ্টেম্বর বিকেলে প্রতিনিধিদের জনজাতীয় সংগ্রহালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্যনাট্য *অথঃ হিন্দি কথা* প্রতিনিধিদের মুগ্ধ করে।

১২ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গভীর বিচার-বিশ্লেষণ করে ১২টি বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। দুপুরে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বিদেশী প্রতিনিধিদের বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। এদিন বিকেলে রামধারী সিং দিনকর সভাকক্ষে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান, পররাষ্ট্র রাজ্যমন্ত্রী বিজয়কুমার সিং, ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ড. রমন সিং, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টার, বিজ্ঞানমন্ত্রী ড. হর্ষবর্ধন, মরিশাসের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী লীলাদেবী দুখন লচমন, মধ্যপ্রদেশের সংস্কৃতিমন্ত্রী সুরেন্দ্র পাটওয়া, গোয়ার রাজ্যপাল শ্রীমতী মৃদুলা সিনহা, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, ভোপালের মেয়র আলোক শর্মা, সাংসদ আলোক সঞ্জর, সাংসদ অনিলমাধব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব অনিল বাধবা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সমাপনী অনুষ্ঠানে ১২টি আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন পাঠ এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়। তারপর হিন্দি ভাষায় বিশেষ অবদানের জন্য দেশি-বিদেশি বিদ্বানদের বিশ্ব হিন্দি সম্মাননা ২০১৫ প্রদান করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে একাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলন ২০১৮ মরিশাসে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমি ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ধানমন্ডি শাখার হিন্দি ভাষা বিভাগের ছাত্র হিসেবে অনলাইনে আবেদন করে ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করি।

সম্মেলনস্থলের পাশেই একটি হোটেলে আমার থাকার ব্যাবস্থা হয়েছিল। সম্মেলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি ভোপাল শহরের মধ্যে অবস্থিত শ্রীরাম মন্দির, ছোট হ্রদ, বড় হ্রদ, রবীন্দ্রভবন, সংকটমোচন হনুমান মন্দির, শ্রী পার্শ্বনাথ জৈন মন্দির, ভারত ভবন, ভিআইপি রোড, বুট ক্লাব, শ্রী মহাবীর স্বামী মহাতীর্থ, মহাবীর গিরি, গুহা মন্দির, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির এবং বিধান সভা ঘুরে দেখি। এছাড়া, শহরের বাইরে ভোজপুর শিব মন্দির, সাঁচী বৌদ্ধবিহার দেখে প্রভূত আনন্দ লাভ করি।

সম্মেলনে যোগদানে সহযোগিতার জন্য ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক শ্রীমতী জয়শ্রী কুণ্ডু, হিন্দি অধ্যাপিকা ড. অপর্ণা পাণ্ডে এবং ভারতীয় হাই কমিশনের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

অঞ্জয়রঞ্জন দাস
শিক্ষার্থী হিন্দিভাষা বিভাগ
ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ধানমন্ডি

সৌহার্দ

‘আমরা একযোগে এ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারি’

প্রজাতন্ত্র দিবসে হাই কমিশনার

আজকের সন্ধ্যার প্রধান অতিথি বাংলাদেশের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, বিশিষ্ট মন্ত্রী, সাংসদ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও উপস্থিত সম্মানিত ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াবৃন্দ,

শুভ সন্ধ্যা। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আপনাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা। আজকে ভারতের ৬৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এ সন্ধ্যায় যোগদানের জন্য শুরুতেই আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

আমি বিশেষভাবে স্বাগত জানাতে চাই আইসিসি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী ভারতের অনুর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট দলকে। দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন কোচ শ্রী রাহুল দ্রাবিড় যার কোন পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। আমি নিশ্চিত, এই টুর্নামেন্টে সবাই তাদের সৌভাগ্য কামনা করছেন।

২৬ জানুয়ারি এমন একটি দিন, যেদিন ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হয়েছিল। আমাদের স্পন্দনশীল বহুমুখি গণতন্ত্রের ভিত্তি এই সংবিধান আলোকশিখা হিসেবে আমাদের পথ নির্দেশ করছে। সংবিধান আমাদের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, সাম্য, মুক্তি ও সৌভ্রার্তৃত্ব জোরদার করেছে। এর প্রাসঙ্গিকতা আগেও ছিল, এখন বরং আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১৫ সাল বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ২০১৫ সালের জুন মাসে বাংলাদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর যুগান্তকারী সফর এবং এ সফরের ফলে রেকর্ডসংখ্যক ২২টি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 'নতুন প্রজন্ম নই দিশা' শীর্ষক যৌথ ঘোষণায় এই সম্পর্ককে আরো এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। এ সফরে যে-সব চুক্তি ও সমঝোতা হয়েছিল, আমরা তার আশু বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ,

২০১৫ সাল অন্য আরেকটি কারণেও বিশিষ্ট হয়ে থাকবে। এ বছর ভারত ও বাংলাদেশ ১৯৭৪ মাসের সীমানা চুক্তি বাস্তবায়নের মত অসমাপ্ত একটি বিরাট কাজ সম্পন্ন করেছে। এই প্রথমবারের মত ছিটমহল নামে একদা পরিচিত ভারতীয় ও বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ভারত ও বাংলাদেশের পতাকা উড়েছে এবং ভারত ও বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ তাদের নিজ নিজ দেশের নাগরিকত্ব পেয়েছে। ইতিহাসের এক ব্যতিক্রমধর্মী মানবিক পরিস্থিতি তারা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। এটি আমাদের একত্রে অর্জিত অনেক উদাহরণের একটি। আমাদের সম্পর্ক ক্রমবর্ধমান এবং শুধু নেতৃত্ব নয়, সকল পর্যায়ে পৌনঃপুনিক বিনিময়ের মধ্যে এর প্রতিফলন ঘটেছে। এই সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার এবং এর নানা দিক-উন্মোচনের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতে আমাদের নেতৃত্বে প্রতিবেশীকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম ও প্রিয়তম বন্ধু। অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা একযোগে কাজ করছি– এসবের মধ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, নিরাপত্তা অন্যতম। উন্নয়নের সুফল এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আমাদের জনগণের কাছে পৌঁছতে হবে।

বিশ্বের এই অঞ্চলের দেশসমূহ অনুধাবন করেছে যে, মানুষের পারস্পরিক মঙ্গলের জন্য এতদ্বঞ্চলে যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের একযোগে কাজ করতে হবে এবং এভাবেই আমরা আমাদের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারব।

ভারত ও বাংলাদেশ ভাষা ও সংস্কৃতির এক আবেগময় বন্ধনে আবদ্ধ– যা দু'দেশের সরকারের আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের অনেক ওপরে। আমাদের জনগণ এক এবং আমরা একযোগে এ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারি।

ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ,

আপনাদের সবার সঙ্গে আমার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়, তবে আমি ও আমার পরিবার বাংলাদেশে আমাদের অবস্থানকালে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, আপনাদের সম্পর্কে জানতে উদ্‌গ্রীব। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর ব্যস্ত সময়সূচি থেকে কিছু সময় বের করে আজকের সন্ধ্যায় উপস্থিতির জন্য যথোচিত কৃতজ্ঞতা জানাই। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা। জয় হিন্দ।

● নিজস্ব প্রতিনিধি

নিবন্ধ

এসেছ জ্যোতির্ময়...

ড. মোহাম্মদ সেলিম

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধুকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানানোর জন্য গোটা বাঙালি জাতি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল, আনন্দে আত্মহারা ছিল লাখো মানুষ, কখন তাদের প্রিয়নেতা স্বাধীন বাংলার মহান স্থপতি স্বাধীন দেশের মাটিতে বন্দিত্বের নাগপাশ ছিন্ন করে বীরের বেশে, বিজয়ানন্দে নামবেন বিমান থেকে। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রিয় জন্মভূমির মাটিতে তেজগাঁও বিমানবন্দরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় এক আবেগঘন ও আনন্দমুখর মুহূর্ত। আনন্দে আবেগে আত্মহারা হয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু। শুরু হয় বাংলাদেশের এক নতুন অভিযাত্রা।

শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁকে ঢাকায় জানানো হয় অভূতপূর্ব অভিনন্দন। অবিতর্কিত নেতার প্রতি জনগণের এই অভিনন্দন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও অন্তর উৎসারিত। ঐ দিন ছিল সরকারি ছুটি। পুরাতন বিমান বন্দর থেকে রমনা রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ জনতা উপস্থিত হয় প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখার জন্য। রেসকোর্সের অগণিত জনতার সমাবেশে শেখ মুজিব ভারত ও রাশিয়াকে ধন্যবাদ জানান মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদানের জন্য। তিনি ভারতের ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে বলেন, আমাদের গভীরতম জাতীয় সংকটে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, সরকার, সাধারণ জনগণ যে সহায়তা প্রদান করেছে, সে জন্য বাংলাদেশ তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি দু'টি শ্লোগান উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন: 'জয় বাংলা' এবং 'ভারত-বাংলাদেশ ভাই ভাই'।

যে দেশ, যে স্বাধীনতার জন্য জীবনবাজি রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সেই মাটিতে পা দিয়েই তিনি আবেগে কেঁদে ফেলেন। পুরো দেশের মানুষই যেন জড়ো হয়েছিল ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দর এলাকায়। বঙ্গবন্ধুর বৃদ্ধ পিতা শেখ লুৎফর রহমান তাঁর প্রিয় খোকাকে দেখার জন্য একটি হুইল চেয়ারে বসে বিমান বন্দরে এসেছেন। ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়েছিল তাঁর আগমনের পথ। বিমানবন্দর থেকে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর পর্যন্ত ছিল মানুষের ঢল। তেজগাঁও বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমানটি অবতরণ করার পর খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে জনসমুদ্রের ভেতর দিয়ে রেসকোর্স ময়দানে এসে পৌঁছতে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য, রেসকোর্স ময়দান যেন জনসমুদ্র। তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা দিতে সবাই উদগ্রীব। বিকাল পাঁচটায় প্রায় ১০ লাখ লোকের উপস্থিতিতে তেজোদীপ্ত 'জয় বাংলা' শ্লোগানে কেঁপে উঠেছিল রেসকোর্স ময়দান, জনসমুদ্রে উঠেছিল উত্তাল গর্জন। 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু', 'তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি', 'পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা'– এসব ধ্বনিতে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে স্বাগত জানায় বাংলার জনগণ। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১৭ মিনিট ভাষণ দেন– যা ছিল জাতির জন্য দিকনির্দেশনা। বাংলাদেশের আদর্শগত ভিত্তি কী হবে, রাষ্ট্রকাঠামো কী ধরনের হবে, পাকিস্তানী বাহিনির সঙ্গে যারা দালালি ও সহযোগিতা করেছে তাদের কী হবে, বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বের স্বীকৃতিদানের অনুরোধ, মুক্তিবাহিনি, ছাত্রসমাজ, কৃষক, শ্রমিকদের কাজ কী হবে, এসব বিষয়সহ বিভিন্ন দিকে নির্দেশনা ছিল সেই আবেগময় ভাষণে। তিনি ডাক দেন দেশ গড়ার সংগ্রামে। রেসকোর্সে জনসভায় তিনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়েন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'বিশ্বকবি তুমি বলেছিলে 'সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তুমি দেখে যাও, তোমার আক্ষেপকে আমরা মোচন করেছি। তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণিত করে আজ ৭ কোটি বাঙালি যুদ্ধ করে রক্ত দিয়ে এই দেশ স্বাধীন করেছে। হে বিশ্বকবি তুমি আজ জীবিত থাকলে বাঙালির বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে নতুন কবিতা সৃষ্টি করতে।'

কিন্তু পঁচাত্তরে অদ্ভুত এক আঁধার নেমে এসেছিল এই দেশে। সাহিত্য, মননশীলতা, মানবিকতা, সভ্যতার মূল্যবোধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সব বেদখল হয়ে যায় বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নিধনের পর। বন্দুকের নলের কাছে অনেকে বশ্যতা স্বীকার করল। স্বৈরাচারীচক্র পুলকিত হল কিন্তু ইউনিফর্মধারীরা তারপরও স্বস্তি পায় না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করেও খুনিচক্র তাদের অবৈধ ক্ষমতা দখলকে নিরঙ্কুশ করতে পারেনি। চক্রান্তকারীদের ভয় বঙ্গবন্ধুকে। গণমাধ্যমসহ সরকারি প্রচার মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু' নিষিদ্ধ করা হল।

রাজধানী ঢাকায় খুনীদের অভয়দানের জন্য বঙ্গবন্ধুর মরদেহ গোপালগঞ্জে দাফন করা হল। পুরস্কার, অর্থ-বিত্ত, ক্ষমতা– কতকিছুই পেল খুনীরা। আইনী সুরক্ষা হিসেবে ইনডেমনিটি দেওয়া হল। এত কিছু করেও শেষ রক্ষা হল না। এই দেশে খুনীদের বিচার হয়েছে, ফাঁসির রায় কার্যকর হয়েছে। কারণ এটাই ইতিহাসের শিক্ষা, এটাই প্রকৃতির বিধান।

অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধতার প্রলেপ দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে 'ভিলেন' বানানো ছাড়া খুনিদের কী বা করার ছিল? ভাড়াটে লেখকরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করলেন বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে। এই সব রচনা আর যাই হোক ইতিহাস পদবাচ্য নয় কোনভাবে। কারণ বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু। জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক তাঁর *বাংলাদেশ: জাতির অবস্থা* বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের স্বাতন্ত্র্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসে তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) আগে অন্যান্য আরো প্রতীক ছিল। কিন্তু ১৯৭১ এর প্রতীক এবং তার আগের প্রতীকগুলোর মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য রয়েছে। শুধু দুটো উদাহরণ নেয়া যাক। গান্ধী এবং জিন্নাহ। দু'জনের প্রত্যেকেই কোটি কোটি মানুষকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। জিন্নাহ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, যুক্তিতে দক্ষ এবং নিবেদিত প্রাণ জননেতা যিনি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে যে উদ্দেশ্যে সঠিক মনে করেছেন তার পক্ষে কাজ করেছেন।... গান্ধী ছিলেন আলাদা। তিনি প্রেমের কথা প্রচার ও প্রতিপালন করেছেন। অবশ্য তাঁর কাছে প্রেম ছিল ধর্ম-সব মানুষের ধর্ম।... আর কখনোই রাজনীতির তিনি বাইরে ছিলেন না।... উভয়েরই ছিল কোটি কোটি ভক্ত। এই সব জনতার কেউই গান্ধী বা জিন্নাহকে তাদের নিজেদের একজন বলে ভাবতে পারতো না। এটাই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জিন্নাহ বা গান্ধীর পার্থক্য। বঙ্গবন্ধু জাতি আর তাঁর নিজের মধ্যে একটা অবিভাজ্য মেলবন্ধন গড়ে তুলেছিলেন।'

একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে অধ্যাপক রাজ্জাকের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ অস্বীকারের জো নেই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (১৯২০-১৯৭৫), তাঁর জীবনের পুরো সময় ব্যয় করেছেন রাজনীতির পেছনে। প্রায় ১৭/১৮ বার গ্রেফতার হয়েছেন। কিছুটা ক্ষোভ থেকে আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন 'সামান্য হলেও কিছুটা আন্দোলনও করেছি (পাকিস্তানের) স্বাধীনতার জন্য। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস আজ আমাকে ও আমার সহকর্মীদের বছরের পর বছর জেল খাটতে হচ্ছে। আরও কতকাল খাটতে হয় কেইবা জানে?'

২৪ বছর পাকিস্তানি শাসনের প্রায় ১৩ বছর বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে থাকতে হয়েছে। যে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সেই স্বপ্নের পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ সময় বিনা বিচারে অগণিত মিথ্যা মামলায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে কারাগারে বন্দি ছিলেন। কারণ তিনি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে অথবা ক্ষমতার লোভে রাজনীতি করেননি। মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে দলের দায়িত্ব নিয়েছেন। আদর্শের প্রশ্নে কখনোই আপোস করেননি। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে পূর্ব বাংলার গভর্নর মেজর জেনারেল ইসকান্দর মির্জা পাকিস্তানের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদকে প্রেরিত গোপন প্রতিবেদনে লিখেছিলেন যে, 'May be described as the stormy petrel of the Awami League. A dangerous gentleman who is best in jail.'

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে গ্রেফতার, মামলা, কারাগার নতুন কিছু ছিল না। এসব স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছেন, তাই ভয় ডর বলে কিছু ছিল না। নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে কখনো আপোস করেননি। বাঙালি জাতির মুক্তিদাতা শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের আনুষ্ঠানিক সূচনা গোপালগঞ্জ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্পাদক হিসেবে। ১৯৩৯ সালে। লিখেছেন তিনি, 'আমি আস্তে আস্তে রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করলাম। আব্বা আমাকে বাধা দিতেন না, শুধু বলতেন, লেখাপড়ার দিকে নজর দেবে।'

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এই মহান বীরের জীবনাবসান ঘটে। ১৯৩৯ থেকে ১৯৭৫, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপ্তিকাল ৩৬ বছর। এই সময়কালের মধ্যে বঙ্গবন্ধু বিশ্বের মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামে একটি জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের মাধ্যমে একটি শক্ত ভিত নির্মাণে অতুলনীয় সাফল্য অর্জন করেন। সমকালীন অন্যান্য রাজনীতিকদের সঙ্গে তুলনা করলে তাঁর অবস্থান ও অবদানের স্বাতন্ত্র্য সহজে নজরে পড়ে। মওদুদ আহমদের মত একান্ত ব্যক্তিস্বার্থবাদী রাজনীতিকও লিখেছেন যে, 'শেখ মুজিব ছিলেন সেই ব্যক্তি, জীবনব্যাপী যিনি এই জাতির স্বার্থে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন, বিরাজ করেছিলেন এই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হিসেবে।... স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ চিরদিন শেখ মুজিবের কীর্তি হিসেবে ইতিহাসের পাতায় অমলিন হয়ে থাকবে।'

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ছিল পুরো মাত্রায় নীতি ও আদর্শ নির্ভর।

তিনি বরাবর আদর্শের ওপর জোর দিয়েছেন। জনস্বার্থে ক্ষমতায় যেতে চেয়েছেন কিন্তু আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আদর্শিক মিল নেই এমন দলের সঙ্গে জোট গঠনের তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'যুক্তফ্রন্ট করলে ক্ষমতায় যাওয়া যেতে পারে, তবে জনসাধারনের জন্য কিছু করা সম্ভব হবে না, আর এ ক্ষমতা বেশি দিন থাকে না।' ৫৪'র নির্বাচন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ বঙ্গবন্ধুর ভবিষ্যৎ বাণীকেই সত্য প্রমাণ করেছে।

বঙ্গবন্ধুর কাছে রাজনীতির অপর নাম ছিল দেশ সেবা। সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করাই ছিল তাঁর কাছে দেশ সেবা। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান (১৮৮১-১৯৭৫) এবং সহধর্মিণী ফজিলাতুন্নেছা মুজিব (১৯৩০-১৯৭৫) সব সময় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না এই জাতির মুক্তিসংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারবর্গও অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁর পরিবার-পরিজনকেও নানারকম হয়রানি, দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ১৫ আগস্ট তাঁর পরিবার হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার প্রতি গভীর মমত্ব, ভালবাসা থাকলেও, সূক্ষ্ম কর্তব্যবোধ তাঁকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধতে পারেনি। তাঁর গভীর দেশপ্রেমের কাছে সব ম্লান হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক লিখেছেন, 'দেশ প্রেমের সংজ্ঞাকে যতো ব্যাপক করে তোলা যাক না কেন, বঙ্গবন্ধু ততোখানিই তাঁর দেশকে ভালোবাসতেন।... পৃথিবীর সেই ছোট্ট অংশটার প্রেমে তিনি বিহ্বল ছিলেন যার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ।' বস্তুত পক্ষে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম ছিল অবিভাজ্য। দেশের মর্যাদা, স্বার্থ, কল্যাণের সঙ্গে তিনি কখনো আপোস করেননি। রাজনীতিক, মন্ত্রী বা সরকার প্রধান হিসেবে তিনি দেশের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করেছেন এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই।

পুত্র মুজিব ও পিতা মুজিব– একই সঙ্গে ছিলেন স্নেহ, মমতা ও কর্তব্যবোধের প্রতীক। পুত্র হিসেবে তিনি ছিলেন পিতা-মাতার স্নেহধন্য। আবার পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা আর কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। তরুণ মুজিবের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর পিতা কখনো বাধা দেননি। তবে সব সময় সততা, নিষ্ঠা ও শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্বদানের জন্য তাঁকে ১৫ টাকা জরিমানা করা হয়। বঙ্গবন্ধু জরিমানা পরিশোধ না করায় তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। উল্লেখ্য পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী তখন তিনি আইন পড়া শুরু করেছিলেন। এই ঘটনায় তাঁর পিতা খুবই দুঃখ পেয়েছেন। তিনি মুজিবকে বলেন, 'যদি ঢাকায় না পড়তে চাও, তবে বিলেত যাও। সেখান থেকে বার এট ল' ডিগ্রি নিয়ে এস, যদি দরকার হয় আমি জমি বিক্রি করে তোমাকো টাকা দিব।' এই প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু সম্মত হননি। ব্যারিস্টার হয়ে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির কথা ভাবতে পারেননি। বরং পূর্ব বাংলার অধিকার আদায়ের জন্য মুসলিম লীগের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রাজনীতির পথ বেছে নিলেন।

পিতা হিসেবে মুজিবও তাঁর সন্তানদের লেখাপড়ার ওপর সব সময় গুরুত্ব দিয়েছেন। অধিকাংশ সময় কারাগারে বন্দী থাকায় বঙ্গবন্ধু নিজে সন্তানদের দেখাশুনা না করতে পারলেও বিভিন্ন সময়ে তাঁর পিতা ও স্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন। রাজবন্দী হিসেবে ঢাকা জেল থেকে ১২ নভেম্বর ১৯৫৮ তারিখে তিনি তাঁর পিতাকে এক পত্রে লেখেন, 'আব্বা, আমার ভক্তিপূর্ণ ছালাম গ্রহণ করবেন ও মাকে দিবেন। মা এবার খুব কষ্ট পেয়েছিল, কারণ এবার তাঁর সামনেই আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল। দোয়া করবেন মিথ্যা মামলায় আমার কিছুই করতে পারবে না। আমাকে ডাকাতি মামলার আসামীও একবার করেছিল। আল্লাহ আছে, সত্যের জয় হবেই। আপনি জানেন আমার কিছুই নাই। দয়া করে ছেলেমেয়েদের দিকে খেয়াল রাখবেন। বাড়ি যেতে বলে দিতাম, কিন্তু ওদের লেখাপড়া নষ্ট হয়ে যাবে।... চিন্তা করে মন খারাপ করবেন না। মাকে কাঁদতে নিষেধ করবেন। আমি ভালো আছি।' ঢাকা জেল থেকে ১৬ এপ্রিল ১৯৫৯ তারিখে স্ত্রীকে লেখা পত্রে সন্তানদের প্রতি পিতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক মমতা, উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। চিঠিতে লিখেছেন, '... ঈদের পরে আমার সাথে দেখা করতে এসেছো, ছেলেমেয়েদের নিয়ে আস নাই। কারণ তুমি ঈদ করো নাই। ছেলেমেয়েরাও করে নাই। খুবই অন্যায় করেছো।... কেন যে চিন্তা করো, বুঝি না। আমার কবে মুক্তি হবে তার কোন ঠিক নাই। তোমার একমাত্র কাজ হবে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখানো। টাকার দরকার হলে আব্বাকে লেখিও, কিছু কিছু মাসে মাসে দিতে পারবেন।'

আর্থিক বিষয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর পিতা ও সহধর্মিণীর ওপর কমবেশি নির্ভরশীল ছিলেন। আত্মজীবনীর বহু স্থানে তিনি এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, 'রেণু খুব কষ্ট করত, কিন্তু কিছুই বলত না। নিজে কষ্ট করে আমার জন্য টাকা পয়সা জোগাড় করে রাখত যাতে আমার কষ্ট না হয়।' সে সময়ে দৈনিক ইত্তেহাদে চাকরির সুবাদে অনিয়মিত বেতন পেতেন। আর বাড়ি থেকে বাবার পাঠানো অর্থে ব্যয়নির্বাহ করতেন। তিনি আক্ষরিক অর্থেই সাধারণ জীবন যাপন করতেন। প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হবার পরও রকমফের কিছু হয়নি।

বাংলাদেশের নামকরণ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় এ ভূখণ্ড পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণের ঘোষণা দেয়। গণপরিষদ সদস্যদের মধ্যে একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'স্যার, আপনি দেখবেন ওরা 'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা এটাকে বাংলা ডাকেন। 'বাংলা' শব্দটির একটি নিজস্ব ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আছে। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। '

এ প্রতিবাদের ১৪ বছর পর ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে তিন নেতার সমাধি প্রাঙ্গণে এক সভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন আজ হতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হবে 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে বাংলাদেশ। এ ভূখণ্ডের ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যে কোন চক্রান্তের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু কখনো দ্বিধান্বিত ছিলেন না। বিনা সংশয়ে, শাসক গোষ্ঠীর ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে মাতৃভূমির মর্যাদার প্রশ্নে ছিলেন আপোসহীন।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা : সশস্ত্র তৎপরতা

১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলা বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। পাকিস্তান আমলে তো বটেই, এমন কি স্বাধীনতার পরেও দীর্ঘ সময় পাঠ্য পুস্তকসহ ইতিহাস গ্রন্থে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা বলা হত। যদিও সরকারি দলিলপত্রে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য' নামে অভিহিত হয়েছে। এ মামলায় বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। শেখ মুজিবসহ

অভিযুক্ত সকলকেই আদালতে অভিযোগ অস্বীকার করেন।

শেখ মুজিব আত্মপক্ষ সমর্থন করে আদালতে দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, 'আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচী রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই।... আমি কখনো পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোনোকিছু করি নাই কিংবা কোনোদিনও এই উদ্দেশ্যে কোনো স্থল, নৌ বা বিমানবাহিনীর কোনো কর্মচারীর সংস্পর্শে কোনো ষড়যন্ত্রামূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করি নাই।'

পাকিস্তানে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ মামলা প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় ইন্টার সার্ভিস ইন্টিলিজেন্স (ISI) মামলার তদন্ত ও প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করে। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে বিশেষ ট্রাইবুন্যালে আগরতলা মামলার বিচার কাজ শুরু হয়। বিশেষ ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান করা হয় জাস্টিস এস এ রহমানকে, যিনি ছিলেন একজন পাঞ্জাবি। রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান কৌসুলি ছিলেন আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের। যিনি বাঙালি বিদ্বেষী হিসেবে পরিচিত। মামলা পরিচালনায় আটঘাট বেঁধে চিরশত্রু শেখ মুজিবকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামে আইয়ুব সরকার। যৌক্তিক কারণেই সকল অভিযুক্ত তাদের আনীত অভিযোগসমূহ অস্বীকার করে নিজেদের নির্দোষ দাবি করেছেন।

বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে আগরতলা মামলার গুরুত্ব অপরিসীম, বর্তমানে অনেকের আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা বা সাক্ষাৎকারে আগরতলা মামলা এবং সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশ স্বাধীন করার নানা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা জানা যাচ্ছে। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দীন, কমান্ডার আব্দুর রউফ তাঁদের আত্মজীবনীতে আগরতলা মামলা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ফুপাত ভাই মমিনুল হক খোকার স্মৃতিকথা *অন্তরাগে স্মৃতি সমুজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও আমি*, শশাঙ্ক এস ব্যানার্জির গ্রন্থের নাম *ইন্ডিয়া, মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ লিবারেশন এন্ড পাকিস্তান*। কর্নেল শওকত আলী রচিত *সত্য মামলা আগরতলা* উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী অবস্থায় এক প্রহসনের বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি ঢাকায় পদার্পণ করেন। এর পূর্বে পাকিস্তান থেকে সরাসরি তাঁকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়, পাকিস্তান বাহিনির বিশেষ বিমানে। অতঃপর ব্রিটিশ বাহিনির একটি বিশেষ বিমানে তিনি দিল্লি হয়ে ঢাকায় আসেন। লন্ডন থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা পথে অন্যান্যের মধ্যে ভারতীয় কূটনীতিক শশাঙ্ক এস ব্যানার্জিও তাঁর সফরসঙ্গী হলেন। উল্লেখ্য শশাঙ্ক ব্যানার্জি ১৯৬২ সাল থেকেই বঙ্গবন্ধুর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। যাত্রাপথে অনানুষ্ঠানিক নানা বিষয়ে দু'জনের মত বিনিময় হয়। স্মৃতি কথায় শশাঙ্ক ব্যানার্জি লিখেছেন, 'আমি মুজিবকে বেশ খোশ মেজাজে দেখলাম। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং ভারতের জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গান 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গাইতে শুরু করলেন এবং আমাকে তাঁর সাথে অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। প্রথমবার ছিল অনেকটা রিহার্সেল এর মতো, তিনি যখন দ্বিতীয়বার গাইতে শুরু করলেন, তখন তা আরো বলিষ্ঠ ও আবেগী মনে হচ্ছিল। আমি এক ঝলকের জন্য তার আবেগে অশ্রুসিক্ত চোখ দেখতে পেলাম। আমি এতদিন তাঁকে উৎফুল্ল মানুষ হিসেবে জানতাম, কিন্তু তাঁর সত্যিকারের ভেতরের মানুষটাকে বাইরে এনে দিয়েছে, যে একজন আপসহীন দেশপ্রেমিক।'

দিল্লিতে শেখ মুজিব পালাম বিমান বন্দর এবং দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের প্যারেড গ্রাউন্ডে বক্তব্য প্রদান করেন। শীতের সকালে প্রচন্ড ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে ব্যাপক লোক সমাগম ঘটে বিমান বন্দরে। বিমান বন্দরে শেখ মুজিবকে স্বাগত জানিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি বলেন, 'আমাদের দুটি দেশ, বন্ধুত্বের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ এবং উভয় জাতিই গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শের জন্য নিবেদিত।' রাষ্ট্রপতি গিরির স্বাগত বক্তব্যের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, তিনি দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেছেন ভারতের জনগণ, সরকার ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য 'to the best friends of my people.' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'You all have worked so untiringly and sacrificed so gallantly in making this journey possible, this journey from darkness to light, from captivity to freedom, from desolation to hope.' প্যারেড গ্রাউন্ডে শেখ মুজিবকে স্বাগত জানিয়ে মিসেস গান্ধী বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জনগণের কাছে মুক্তির প্রতিশ্রুতি করেছিলেন এবং তিনি তা প্রদান করেছেন। ভারতও কিছু অঙ্গীকার করেছিল তাহলো বাংলাদেশকে মুক্ত করা, মুজিবকে মুক্ত করা এবং অন্তিমে শরণার্থীদের তাদের বাড়ি ও ভিটেমাটিতে ফেরত পাঠানো। আমরাও আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি।' তিনি আরও বলেন, 'এখন বঙ্গবন্ধু বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর (শেখ মুজিব) নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটবে।' নয়াদিল্লির জনসভায় শেখ মুজিব পুনরায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী, সরকার, সেনাবাহিনি ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন যে, তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, মানুষের স্বাধীনতা এবং বিশ্বের শান্তির আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, 'Sonar Bangla would prosper amid undying friendship between the two countries.' মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 'জয় হিন্দ' শ্লোগান দিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। মিসেস গান্ধী সঙ্গে সঙ্গে 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

শেখ মুজিব এবং মিসেস গান্ধীর মধ্যে এটি ছিল প্রথম সাক্ষাৎ। পাকিস্তানের কারাগারে প্রায় দশ মাস অন্তরীণ থাকার পর স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে যাবার পথে শেখ মুজিব যাত্রাবিরতি করেন। স্বল্পকালীন বিরতিকালে শেখ মুজিবের সম্মানে নয়াদিল্লিকে ফুল, মুজিবের পোর্ট্রেট, বিভিন্ন ব্যানারে সুশোভিত করে তোলা হয়। ব্যানারে লেখা ছিল 'বাংলাদেশের স্রষ্টা দীর্ঘজীবী হও' এবং 'বাংলাদেশের মুক্তিদাতা দীর্ঘজীবী হও'। প্রচণ্ড ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে বিরাটসংখ্যক সাধারণ জনগণ প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে রাষ্ট্রপতি ভবন পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থেকে শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানায়। মুজিব কেবল সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিলেন তা নয়, কারণ প্রধানমন্ত্রীর পুত্রবধূ সোনিয়া গান্ধী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পারিবারিক নিষেধ উপেক্ষা করে বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন মুজিবকে দেখার জন্য। অর্থাৎ ভারতের জনগণ এবং সরকার যেমন আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে তেমনি শেখ মুজিবের দিক থেকেও ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে আবেগ, উচ্ছ্বাসের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তবে পুরো সফরটি যে কেবল আবেগময় ছিল তা নয়, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের প্রথম ভারত সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

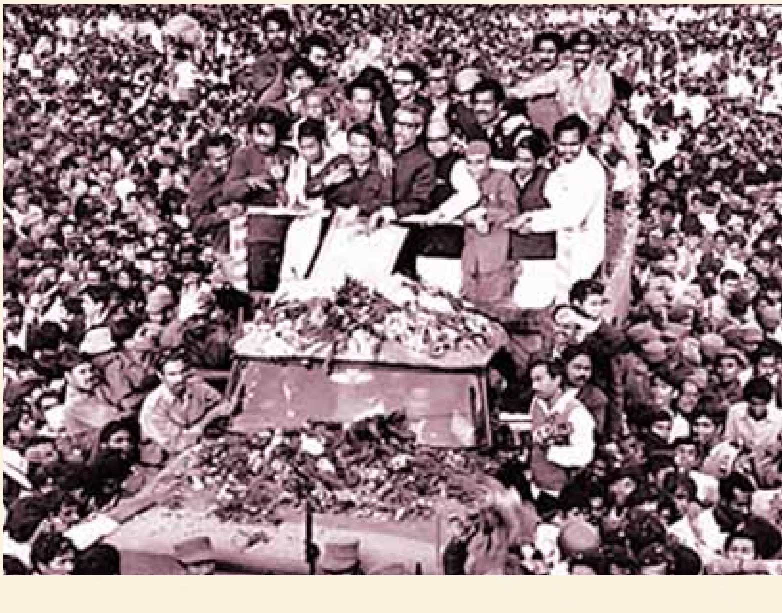

ইতোপূর্বে অস্থায়ী সরকার ভারতের মাটিতে, ভারত সরকারের ওপর সর্বাত্মকভাবে নির্ভরশীল থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। মুজিবের প্রত্যাবর্তনের ফলে পরিপ্রেক্ষিত কিছুটা বদলে যায়। বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শেখ মুজিব ভারত সফর করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী তাঁকে স্বাগত জানিয়ে যে বক্তব্য প্রদান করেন, তাতে দু'দেশের সম্পর্কের আদর্শিক ভিত্তির দিকটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। শেখ মুজিবও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজেকে উক্ত আদর্শের অনুসারী বলে ঘোষণা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আদর্শিক সাদৃশ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই দেখা যায়, শেখ মুজিবের প্রথম সফরে পারস্পরিকভাবে রাষ্ট্রীয় আদর্শের ওপরই জোর দেওয়া হয়।

জীবনের মূল মন্ত্র অসাম্প্রদায়িকতা

শৈশবের শিক্ষা, পিতামাতার ব্যক্তিত্ব, পারিবারিক পরিবেশ মানুষের চিন্তা ও মননে স্থায়ী ছাপ ফেলে যায়। উদার পরিবেশে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহে বেড়ে উঠেছেন শেখ মুজিব। আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। ছোটকাল থেকে আমি সকল কাগজই পড়তাম।' হিন্দু সহপাঠী, প্রতিবেশী সবার সঙ্গে মিলে মিশে বড় হয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতা কখনো তাঁকে স্পর্শ করেনি। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আমি মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখি। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিষ্টান বলে কিছু নাই। সকলেই মানুষ।' সত্যিকার অর্থে জীবন চর্চায় অসাম্প্রদায়িক ছিলেন বলেই ১৯৪৬ সালে ১৬ আগস্ট কলকাতার দাঙ্গায় নানাভাবে মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। দাঙ্গার সময় কারফিউ চলাকালে দাঙ্গা আক্রান্তদের সাহায্য করতে গিয়ে লিখেছেন যে, 'যে কোন সময় গুলি খেয়ে মরতে পারতাম।'

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করেছেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক (১৯৫৩-১৯৬৬) হিসেবে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কখনো ধর্মকে পুঁজি করে রাজনীতি করেননি। সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। যার প্রতিফলন ঘটেছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনির বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি-ধর্ম পরিচয় নির্বিশেষে ইস্পাতকঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এ চেতনার মূর্ত প্রকাশ ১৯৭২ সালের সংবিধান। চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির একটি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংবিধানে যুক্ত হয়েছে। সে সময়ে বিশ্বের খুব কম রাষ্ট্র এমন অগ্রসর চিন্তার অধিকারী ছিলো। উল্লেখ্য দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ প্রথম সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' অন্তর্ভুক্ত করে। বঙ্গবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে, খ্রিস্টান তার ধর্ম পালন করবে, বৌদ্ধও তার ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মনিরপেক্ষতা আছে।'

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকায় মুক্তিযুদ্ধে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। তাঁর সম্মোহনী নেতৃত্বেই সারা জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর নামে শ্লোগান দিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 'জয় বাংলা' ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের রণাঙ্গনে প্রিয় শ্লোগান। একাত্তরে বাঙালির চরম দুর্দিনে দলমত নির্বিশেষে বঙ্গবন্ধু ছিলেন একমাত্র নেতা যিনি সবাইকে অনুপ্রাণিত, আত্মপ্রত্যয়ী ও সাহসী করে তুলেন। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন অতুলনীয় আত্মত্যাগ আর বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম এক হয়ে গেছে। এভাবে খোকা থেকে শেখ মুজিব আর শেখ মুজিব হলেন বাঙালির প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু। দীর্ঘ সংগ্রামের পথ। দুঃখ, কষ্ট, অপমান, অত্যাচার, জীবনের ঝুঁকি– কোন কিছুই বঙ্গবন্ধুকে দমাতে পারেনি। তিনি অপরাজেয়, আপোসহীন, অবিনশ্বর কৃতি পুরুষ। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস কখনো সম্পূর্ণ হবে না। নির্মোহভাবে বলা যায়, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। অনেক জ্ঞানী গুণীজন, পণ্ডিত, বিজ্ঞানী এ তালিকায় ছিলেন। কারো অবদানকে খাটো করা হয়নি, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশেষভাবে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।

ড. মোহাম্মদ সেলিম
ইতিহাসবিদ

ঘটনাপঞ্জি ❖ জানুয়ারি ❖ ফেব্রুয়ারি

০১ জানুয়ারি ১৯১৪	❖	অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্ম
০১ জানুয়ারি ১৯০৩	❖	জসীমউদ্দীনের জন্ম
০৮ জানুয়ারি ১৮৮৪	❖	কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু
০৮ জানুয়ারি ১৯০৯	❖	আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম
১২ জানুয়ারি ১৮৬৩	❖	স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম
১২ জানুয়ারি ১৯৩৪	❖	মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসি
১৪ জানুয়ারি ১৯২৬	❖	মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম
১৬ জানুয়ারি ১৯০১	❖	সুকুমার সেনের জন্ম
১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮	❖	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু
১৯ জানুয়ারি ১৯০৫	❖	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু
২৩ জানুয়ারি ১৮৯৭	❖	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম
২৫ জানুয়ারি ১৮২৪	❖	মাইকেল মধুসূদন দত্তর জন্ম
২৬ জানুয়ারি ১৯৫০	❖	প্রজাতন্ত্র দিবস
৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮	❖	মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু ॥ শহীদ দিবস
১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২	❖	সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯	❖	সরোজিনী নাইডুর জন্ম
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯	❖	কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬	❖	লে. জে. জগজিৎ সিং আরোরার জন্ম
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪	❖	দাদাসাহেব ফালকের মৃত্যু
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯	❖	জীবনানন্দ দাশের জন্ম
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬	❖	শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২	❖	অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম
২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮	❖	লীলা মজুমদারের জন্ম

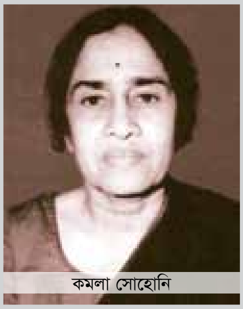
কমলা সোহোনি

আন্না মানি

অসীমা চ্যাটার্জি

রাজেশ্বরী চ্যাটার্জি

দরশন রঙ্গনাথন

মহারানি চক্রবর্তী

চারুসীতা চক্রবর্তী

প্রবন্ধ

ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানী

তপন চক্রবর্তী

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

ভারতীয় বিজ্ঞানীর নাম বলতে বললে প্রথমেই আমাদের কয়েকজন প্রথিতযশা পুরুষ বিজ্ঞানীর নাম মনে পড়ে– কোন মহিলা বিজ্ঞানীর নাম মনে পড়ে না। বিজ্ঞান গবেষণায় ভারতে মহিলা বিজ্ঞানীর সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। সম্প্রতি বিজ্ঞান গবেষণায় নারীর অংশগ্রহণ একটু বাড়লেও তা খুব সন্তোষজনক নয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও পিছিয়ে থাকা অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণায় অংশগ্রহণ আরো কম। বাস্তবে, ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় রোল মডেল হিসেবে মহিলা বিজ্ঞানীর সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। অতীতে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত নারীদের চাকরি বা গবেষণায় নিবেদিত হতে বিস্তর প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। আগে গোঁড়া সমাজের অনুশাসন অমান্য করে মেয়েরা শিক্ষাগ্রহণ করলেও তা ছিল মূলত শিল্পকলাভিত্তিক– বিজ্ঞান শিক্ষায় ছিল ঘোরতর আপত্তি। যে সব শিক্ষার্থীর উদার বাবা, স্বামী বা আপনজনেরা সুশিক্ষিত– তাঁরা বিজ্ঞান শিক্ষায় কিছুটা সহায়তা পেতেন। সাম্প্রতিককালেও একজন বিজ্ঞানের মহিলা শিক্ষক বা গবেষককে সংসারের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে ঢিমেতালে এগোতে হয়। সন্তান ধারণ করা বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরো বেশি– তাঁরা চাকরি বা গবেষণায় দীর্ঘ সময় দিতে পারেন না। একুশ শতকেও একজন মহিলা বিজ্ঞানকর্মী বা গবেষক পুরুষের মত মুক্তভাবে কাজ করতে পারেন না। এতসব দুস্তর বাধা জয় করে যে, সব সংগ্রামী মহিলা ভারতীয় বিজ্ঞানে মহৎ অবদান রেখেছেন এবং অন্যদের কাছে প্রেরণার উৎস এবং আদর্শরূপে গণ্য হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা হাতেগোনা।

গত সংখ্যায় আমরা কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, আনন্দীবাঈ জোসী ও জানকি আম্মাল এডাভ্যাল্যাথ কক্কট নামে ভারতের তিন অগ্রগণ্য বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করেছি। এপর্যায়ে আমরা আরো চারজনের ওপর আলোকপাত করছি। এঁরা হলেন: কমলা সেহোনি, আন্না মানি, অসীমা চ্যাটার্জি, রাজেশ্বরী চ্যাটার্জি, দরশন রঙ্গনাথন, মহারানি চক্রবর্তী ও চারুসীতা চক্রবর্তী।

কমলা সোহোনি

(১৯১২-১৯৯৮)

কমলা সোহোনি ভারতবের্ষের কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞানে প্রথম পি.এইচডি অর্জনকারী মহিলা। কমলা সোহোনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে রিসার্চ ফেলোশিপের জন্য আবেদন করলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রত্যাখ্যানের কারণ আবেদনকারী একজন মহিলা। এই সময় নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর সি ভি রামন (চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন) ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের পরিচালক ছিলেন।

তিনি মহিলা শিক্ষার্থী ভর্তির ঘোর বিরোধী ছিলেন। পরে কমলা সেহোনি তাঁর প্রথম ছাত্রী হিসাবে ভর্তি হন। কমলা এত ভালো কাজ করেন যে, প্রফেসর রামন কমলাকে আরো গবেষণা করার জন্য অনুমতি দেন।

লন্ডনের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকালে তিনি লক্ষ্য করেন যে, উদ্ভিদের কলার প্রতি কোষে সাইটোক্রম সি এনজাইম থাকে। সকল কোষের জারণে এই এনজাইমের ভূমিকা থাকে। আসলে তাঁর রচিত এই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তাঁর পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছিল। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল দরিদ্রতম মানুষদের খাদ্যসম্ভারের ওপর। তিনি নীরার (তাল বা খেজুরের রস। মিষ্টি পানীয়। এর পুষ্টিমান বেশি। এই রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করা হয় এবং গাঁজিয়ে তাড়ি তৈরি করা হয়। তাড়ি পানে নেশা হয়) পুষ্টিমান নিয়ে গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

আন্না মানি

(২৩ আগস্ট ১৯১৮- ১৬ আগস্ট ২০০১)

ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী ও আবহাওয়াবিজ্ঞানী। তিনি ইন্ডিয়ান মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট-এর উপমহাপরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আবহাওয়া নিরীক্ষণের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে তাঁর অবদান রয়েছে। তিনি সৌর তেজস্ক্রিয়তাও বিষয়ে বহু গবেষণাপত্র রচনা করেছিলেন। তিনি তেজস্ক্রিয়তা, ওজোন ও বায়ুর শক্তি পরিমাপ ইত্যাদি বিষয়সমূহের ওপর গবেষণা পরিচালনা করেন।

আন্না মানি ভারতের কেরালা রাজ্যের ত্রিবাঙ্কুরের পেরুমেডুতে জন্মেছিলেন। তাঁর বাবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ছোটবেলা থেকেই তিনি ভীষণ পড়ুয়া মেয়ে। ভাইকম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের (গাঁধি পরিচালিত অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন) সময় মোহদাস করমচাঁদ গাঁধির কর্মকাণ্ড তাঁর মনে দাগ কাটে। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে খাদি পোশাক পরিধান শুরু করেন।

প্রথমে তিনি ডাক্তার হবেন ভেবেছিলেন। পরে মত পরিবর্তন করে তিনি পদার্থবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। পদার্থবিজ্ঞান তাঁর প্রিয় বিষয়। *মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) প্রেসিডেন্সি কলেজ* থেকে তিনি ১৯৩৯ সালে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি প্রফেসর সি ভি রামনের তত্ত্বাবধানে রুবি ও হীরার অপটিক্যাল প্রোপার্টিজ (পদার্থের মধ্যে দিয়ে তড়িৎচুম্বকীয় তেজস্ক্রিয়তার প্রতিসরণ, প্রতিফলন ইত্যাদি) নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি পাঁচটি গবেষণাপত্র রচনা করেন। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকায় তাঁকে পিএইচ ডি ডিগ্রি দেওয়া হয়নি। এরপর তিনি পদার্থবিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রিলাভের জন্য লন্ডন যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি *ইমপেরিয়েল কলেজ লন্ডনে* আবহাওয়া যন্ত্রপাতি সম্পর্কে পড়াশোনা করেন। ১৯৪৮ সালে ভারতে ফিরে তিনি পুনের মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে যোগদান করেন। তিনি আবহাওয়াবিজ্ঞানের সরঞ্জামের ওপর অনেক গবেষণাপত্র তৈরি করেন ও প্রকাশ করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে ভারতীয় আবহাওয়াবিজ্ঞান বিভাগের উপমহাপরিচালকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৯৪ সালে তিনি তিরুবন্তপুরমে হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং ২০০১ সালের ১৬ আগস্ট শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ:

- ওয়াইন্ড এনার্জি রিসোর্চ সার্ভে ইন ইন্ডিয়া;
- সোলার রেডিয়েশন ওভার ইন্ডিয়া এবং
- দ্য হ্যান্ডবুক ফর সোলার র‍্যাডিয়েশন ফর ইন্ডিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অসীমা চ্যাটার্জি

(২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৭-২২ নভেম্বর ২০০৬)

ড. অসীমা চ্যাটার্জি একজন ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রবিদ। অর্গানিক কেমিস্ট্রি (জৈব রসায়ন) ও ফাইটোমেডিসিন (উদ্ভিজ্জ ভেষজ) ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর অন্যান্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে ভিনকা অ্যালক্যালয়ডস গবেষণা {*Caranthus roseus*(*Vinca rosea*) নামক বৃক্ষের নির্যাস যা ক্যানসার কোষ বিভাজনে বাধা দেয়। এই নির্যাস ক্যানসার রোগীতে কেমোথেরাপির মধ্যে ব্যবহৃত হয়} এবং মৃগীরোগ, ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ওষুধ উদ্ভাবন ইত্যাদি রয়েছে। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের ভেষজ উদ্ভিদের ওপর কয়েক খণ্ড গ্রন্থ রচনা করেছেন।

অসীমা চ্যাটার্জি পশ্চিমবঙ্গে ১৯১৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা শহরে বেড়ে উঠেন। কলকাতায় *স্কটিশ চার্চ স্কুল ও কলেজে* পড়াশোনা করেন। তিনি ১৯৩৬ সালে রসায়নশাস্ত্রে স্নতক সম্মান ডিগ্রি লাভ করেন।

অসীমা চ্যাটার্জি *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে জৈব রসায়নে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ও পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল উদ্ভিজ্জাত পদার্থ ও সংশ্লেষী জৈব রসায়ন। সেই সময়ে তাঁর গবেষণাকর্ম পরিচালনায় যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিজ্ঞানী প্রফেসর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও বিজ্ঞানাচার্য প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসু। উপরন্তু, তিনি ম্যাডিসন ও ক্যালটেকে-এর ইউনিভারসিটি অফ উইসকনসিন-এ গবেষণার অভিজ্ঞতাও অর্জন করেন। তিনি ১৯৪০ সালে *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের* অধীন *লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজে* রসায়ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৪ সালে তাঁকে রসায়নশাস্ত্রে পি.এইচডি ডিগ্রি প্রদান করে। তিনি রসায়নশাস্ত্রে প্রথম পি.এইচডি ডিগ্রিধারী ভারতীয় মহিলা। অসীমা ১৯৫২ সালে *ইউনিভারসিটি অফ ক্যালকাটার কলেজ অফ সায়েন্সে* বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগে রীডার হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের মর্যাদাশীল খয়রা প্রফেসর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং এই পদে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বহাল ছিলেন।

- বিজ্ঞানী অসীমা চ্যাটার্জি কলকাতা *বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার*।
- জানকি আম্মালের পর তিনিই দ্বিতীয় ভারতীয় মহিলা যিনি ১৯৪৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (*কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়*) পি. এইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।
- শিক্ষা ও প্রকৃতিতে উৎপাদিত রসায়ন গবেষণা কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করার বিশেষ সহযোগিতা প্রকল্পে তাঁকে ১৯৭২ সালে অবৈতনিক সমন্বয়কারী হিসাবে নিয়েজিত করা হয়। *ভারতের ইউনিভারসিটি গ্র্যান্টস কমিশন* এই প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে।
- ১৯৬০ সালে তিনি দিল্লির *ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্স একাডেমির* ফেলো নির্বাচিত হন।
- ১৯৬১ সালে তিনি কেমিক্যাল সায়েন্সে *শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কারে* ভূষিত হন। এই পুরস্কার অর্জনে তিনিই প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী।
- ১৯৭৫ সালে ভারত সরকার তাঁকে *পদ্মভূষণ পুরস্কার* দিয়ে সম্মান জানান।
- এই বছরেই তিনি *ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস এসোসিয়েশন*-এর *জেনারেল প্রেসিডেন্ট* নির্বাচিত হন। মহিলা বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনিই এই এসোসিয়েশনে প্রথম নির্বাচিত জেনারেল প্রেসিডেন্ট।
- বেশ কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.এসসি উপাধিতে ভূষিত করে।
- ভারতের প্রেসিডেন্ট তাঁকে রাজ্যসভার সদস্য পদে মনোনীত করেন। তিনি এই পদে ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৯০ সালের মে পর্যন্ত কাজ করেন।

রাজেশ্বরী চ্যাটার্জি

(২৪ জানুয়ারি ১৯২২-৩ সেপ্টেম্বর ২০১০)

রাজেশ্বরী চ্যাটার্জি ভারতীয় বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ। তিনি ভারতের কর্নাটক রাজ্যের প্রথম মহিলা প্রকৌশলী। বাঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে অবস্থানকালে তিনি প্রথমে প্রফেসর পদে ও পরে ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেক্ট্রো কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চেয়ারপার্সন পদে কর্মরত ছিলেন।

রাজেশ্বরী ১৯২২ সালে কর্নাটকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ঠাকুরমা প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ইংলিশ স্কুলে পড়াশোনা শেষে *সেন্ট্রাল কলেজ অফ বাঙ্গালোর* (বর্তমান বাঙ্গালুরু) থেকে অঙ্কশাস্ত্রে ১৯৪২ সালে বি এসসি অনার্স ও ১৯৪৩ সালে এম এসসি ডিগ্রি লাভ করেন। কলেজটি *মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয়*-এর অধীন। দুটো পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন এবং *মুম্মাদি কৃষ্ণরাজা উরেয়ার পুরস্কার*, *এম টি নারায়ণা আয়েঙ্গার পুরস্কার* ও *ওয়াল্টারস মেমোরিয়েল পুরস্কারে* ভূষিত হন। অঙ্কশাস্ত্রে এম এসসি পাশের পর তিনি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এ রিসার্চ স্টুডেন্ট হিসাবে যোগ দেন এবং পরে যোগাযোগবিষয়ক ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি বিভাগে ভর্তি হন।

১৯৪৬ সালে দিল্লি সরকার রাজেশ্বরীকে 'আলোকিত শিক্ষার্থী' নির্বাচিত করে বিদেশে থেকে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য স্কলারশিপ প্রদান করেন এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গমনের সিদ্ধান্ত নেন। এই সময়টায় ভারতীয় মহিলাদের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভে বিদেশ ভ্রমণ খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তখন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। কিন্তু রাজেশ্বরী অনমনীয় দৃঢ় চিত্তের মহিলা ছিলেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতালাভের মাসখানেক পরে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ৩০ দিনের মধ্যে আমেরিকায় পৌঁছন।

যুক্তরাষ্ট্রে তিনি *মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে* ভর্তি হন এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী তিনি ওয়াশিংটন ডি সি-তে *ন্যাশন্যাল ব্যুরো অফ স্ট্যান্ডার্ড*-এর রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি মেজারমেন্ট (রেডিও তরঙ্গ পরিমাপ) বিভাগে আট মাস ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি পুনরায় পড়া চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যান। তিনি ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে প্রফেসর উইলিয়াম জি গ্লো'র তত্ত্বাবধানে পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৫৩ সালেই তিনি ভারতে ফিরে তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন বিভাগে ফেলো হিসাবে যোগদান করেন। সেই বছরই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের ফেকাল্টি সদস্য শিশির কুমার চ্যাটার্জিকে বিয়ে করেন। তাঁদের একমাত্র কন্যা ইন্দিরা চ্যাটার্জি যুক্তরাষ্ট্রের রোনোতে অবস্থিত ইউনিভারসিটি অফ নাভাদার ইলেক্ট্রিক্যাল ও বায়োমেডিক্যাল বিভাগের প্রফেসর পদে নিয়োজিত আছেন।

বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী মাইক্রোওয়েব (ক্ষুদ্র তরঙ্গ) ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গবেষণায় রত হন। তাঁরা দ্রুত একটি *মাইক্রোওয়েব রিসার্চ ল্যাবোরেটরি* গড়ে তুলেন। একই সময়ে রাজেশ্বরী প্রফেসর পদে উন্নীত হন এবং ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারপার্সন মনোনীত হন। তিনি বিদ্যুৎ-চুম্বক তত্ত্ব, ইলেকট্রন টিউব ও ক্ষুদ্রতরঙ্গ প্রযুক্তি বিষয়ে পড়াতেন। তিনি গবেষণায়ও খুব সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তীকালে মাত্র কয়েক বছরে তাঁর তত্ত্বাবধানে ২০ জন গবেষক পি. এইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ড. রাজেশ্বরী চ্যাটার্জি মাইক্রেওয়েব ও এন্টেনা বিষয়ে ১০০টি গবেষণাপত্র ও সাতটি গ্রন্থ রচনা করেন। মাইক্রোওয়েব ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিশেষ অবদানের জন্য তিনি নিচে বর্ণিত সম্মাননা অর্জন করেন।

- যুক্তরাজ্যের ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল এন্ড রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে অন্যতম শ্রেষ্ট গবেষণাপত্রের জন্য *মাউন্টব্যাটেন পুরস্কার* অর্জন করেন।
- অতি উত্তম গবেষণাপত্রের জন্য ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং তাঁকে *জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি পুরস্কারে* ভূষিত হন।
- ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রনিকস ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারস উত্তম গবেষণাপত্র ও শিক্ষাদানের জন্য রাজেশ্রী চ্যাটার্জিকে *রামলাল ওয়াদিয়া পুরস্কারে* সম্মানিত করে।

দরশন রঙ্গনাথন

(জুন ৪ ১৯৪১ - জুন ৪ ২০০১)

দরশন রঙ্গনাথন ভারতের জৈব রসায়নশাস্ত্রবিদ। Protein folding (একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় প্রোটিন অণু কার্যকর হওয়ার জন্য আকৃতি লাভ করে) অগ্রণী ভূমিকা পালনসহ জীব-জৈব রসায়নশাস্ত্রে অবদানের জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। এ ছাড়াও supramolecular assemblies, molecular design, chemical simulation of key biological processes, synthesis of functional hybrid peptides and synthesis of nanotubes ইত্যাদি গবেষণায়ও তাঁর কৃতিত্ব রয়েছে।

দরশন রঙ্গনাথনের জন্ম ১৯৪১ সালের ৪ জুন। মা বিদ্যাবতী মারকান ও বাবা শান্তিস্বরূপ। দিল্লিতে লেখাপড়ার পর ১৯৬৭ সালে তিনি *দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে পি.এইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর দিল্লির মিরান্ডা কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন– ক্রমে রসায়ন বিভাগের প্রধান হন। ১৯৫১ *সালে রয়্যাল কমিশন ফর দ্য এক্সিবিশন রিসার্চ ফেলোশিপ* পেয়ে তিনি লন্ডনের *ইমপেরিয়াল কলেজে* প্রফেসর ডি এইচ আর বার্টনের অধীনে পোস্ট ডক্টরশিপ করেন।

দরশন রঙ্গনাথন ১৯৭০ সালে কানপুরের ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান টেকনোলজিতে যোগ দেন। এ বছরেই তিনি এস রঙ্গনাথনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং স্বামীর সঙ্গে তাঁর গবেষণাভিত্তিক গ্রন্থ *Challenging Problems in Organic Reaction Mechanisms (1972), Art in Biosynthesis: The Synthetic Chemist's Challenge (1976) and Further Challenging Problems in Organic Reaction Mechanisms (1980)* প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি Current Organic Chemistry Highlights শীর্ষক একটি সিরিজ সম্পাদনা করছিলেন। তিনি কানপুর আইআইটির ফেলো ছিলেন। আর তাঁর স্বামী ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের ফ্যাকাল্টি সদস্য। অলিখিত নিয়মে একই প্রতিষ্ঠানে স্বামী ও স্ত্রী ফ্যাকাল্টি সদস্য হতে পারেন না।

দরশন ১৯৯৩ সালে ত্রিবান্দ্রাম আঞ্চলিক গবেষণা ল্যাবরেটরিতে যোগ দেন এবং ১৯৯৮ সালে হায়দ্রাবাদের আইআইসিটিতে উপ-পরিচালকের পদে যোগ দেন। ইতোমধ্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নৌ গবেষণা ল্যাবরেটরির ইসাবেলা কারলের সঙ্গে একযোগে কাজ করেন।

দরশন রঙ্গনাথন ল্যাবোরেটরিতে প্রাকৃতিক জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া পুনরুৎপাদনে উৎসাহী ছিলেন। তিনি ইমিডাযোল (imidazole) নামের উপাদান উদ্ভাবন করেন যা হিস্টাডিন (histadine) ও হিস্টামিনের (histamine) উপকরণ। ফার্মাসিউটিকল শিল্পে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি ইউরিয়া চক্রের (urea cycle) সাইমুলেশনও (simulation) উদ্ভাবন করেন। তিনি প্রোটিন ডিজাইনিংয়ে (protein designing) বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বেরও পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৯৭ সালে দরশনের স্তন ক্যানসার ধরা পড়ে। ২০০১ সালে জন্মদিনে তাঁর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর স্মরণে এস রঙ্গনাথন এ বছর *দ্বিবার্ষিক প্রফেসর দরশন স্মৃতি বক্তৃতা* প্রবর্তন করেন। প্রতি দুই বছর পর পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছেন এমন মহিলা বিজ্ঞানীদের একজনকে এই বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

মহারানি চক্রবর্তী

(১৯৩৭-২০১৫)

মহিলা অণু জীববিজ্ঞানী (Molecular Biologist) মহারানি চক্রবর্তী ১৯৮১ সালে এশিয়া ও দূর প্রাচ্যে recombinant DNA techniques-এর ওপরে প্রথম ল্যাবরেটরি কোর্স সংঘটিত করেন। ১৯৩৭ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণকারী মহারানি মাতামহের অনুপ্রেরণায় বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রে গবেষণা শুরু করেন। ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিকুলেশনের পর তিনি *প্রেসিডেন্সি কলেজ* থেকে স্নাতক ও *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে এম এসসি ডিগ্রি লাভ করেন। ড. দেবীপ্রসাদ বর্মার তত্ত্বাবধানে *কলকাতা বোস ইনস্টিটিউট* থেকে পিএইচ ডি লাভ করেন। গবেষণার বিষয় ছিল অণুজীবীয় প্রোটিন সংশ্লেষণ (microbial protein synthesis)। *Azotobacter vinelandii* থেকে

পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রস্তুত প্রণালি (particulate preparation)সহ কোষমুক্ত প্রোটিন সংশ্লেষণ (cell free protein synthesis) প্রদর্শন করেন। এটি তাঁর গবেষণাকর্মের একটি অংশ। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের *New York University School of Medicine*-এর লঙ আইল্যান্ডস্থ বি এল হোরেকার ল্যাবরেটরিতে উৎসেচক রসায়নে (enzyme chemistry) পোস্ট ডক্টরিয়েল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে *Salmonella typhimurium*-এর ঝিল্লি কমপ্লেক্সে (membrane complex) কেবল ডিএনএ সংশ্লেষণ (Desoxy Ribose Neucleic Synthesis) নয়, আরএনএ সংশ্লেষণে (Ribose Nucleic Acid Synthesis) ১০০০এস (1000S) সেডিমেন্টেশন কন্‌ট্যান্ট (sedimentation complex) থাকে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে তিনি বোস ইনস্টিটিউটে যোগ দেন এবং *এককোষী জীবের* বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। পরে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে যোগ দেন। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল কোষে লাইসোজেনি (Lysogeny) ঘটছে এবং যে সকল কোষে লাইসিস ঘটছে (Lysis) তাদের মধ্যেকার জৈবরাসায়নিক পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করেন। ভাইরাস সংক্রমণ প্রোটিন সংশ্লেষণ রূপান্তরিত হওয়ার পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় বলে তিনি অনুমান করেন। গবেষণাকালে তিনি ড. দেবীপ্রসাদ বর্মার সঙ্গে *S. typhimurium*-এর ন্যূন বিপরিণত RNase 1-কে আলাদা করেন। তিনি বেনারস হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে অণু জীববিজ্ঞান ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেন।

- বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৫-৭৬) তাঁকে ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের *সার্টিফিকেট অফ মেরিট* প্রদান করে।
- একই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৬ সালে তাঁকে *সর্বোত্তম গবেষণার জন্য পুরস্কার* প্রদান করে।
- ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) ১৯৭৯ সালে *ক্ষণিকা বক্তৃতা পুরস্কার* প্রদান করে।
- একই প্রতিষ্ঠান ১৯৮১ সালে তাঁকে ওয়াই. এস নারায়ণ রাও পুরস্কার প্রদান করে। মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ১৯৮১ সালে *হরি ওম আশ্রম এলম্বিক গবেষণা পুরস্কারে* ভূষিত করে।
- তিনি *জে সি সেনগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার* লাভ করেন।
- ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্স একাডেমি ২০০৭ সালে *প্রফেসর দরশন রঙ্গনাথন স্মৃতি পুরস্কার* প্রদান করে।

তিনি সহকর্মী বিজ্ঞানী ড. দেবীপ্রসাদ বর্মাকে বিয়ে করেন। তাঁদের দুটি সন্তান জন্মেছিল। ২০১৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

চারুসীতা চক্রবর্তী

(৫মে ১৯৬৪–)

চারুসীতা ১৯৯৯ সাল থেকে *দিল্লির ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির* রসায়ন বিভাগে প্রফেসর পদে কাজ করছেন। কেমিক্যাল সায়েন্স ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অবদানের জন্য ২০০৯ সালে তাঁকে *শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কারে* ভূষিত করা হয়। ১৯৯৯ সালেই তিনি *বি এম বি বিড়লা পুরস্কার* অর্জন করেন। ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমির ১৯৯৯ সালে *অনিলকুমার বোস স্মৃতি পুরস্কার*, ২০০৪ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের (ভারত) ফেলোশিপ ও ২০০৬ সালে ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেস, বাঙ্গালুরুর ফেলোশিপ অর্জন করেন। চারুসীতা যুক্তরাষ্ট্রে, ক্যামব্রিজের ম্যাসাচুসেটসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি *দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট স্টেফেন'স কলেজ* থেকে বি এসসি ডিগ্রি লাভ করেন। পরে *ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে দুই বছর অধ্যয়ন করে প্রকৃতি বিজ্ঞানে *ট্রাইপস* অর্জন করেন। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েই ডেভিড ক্ল্যারির তত্ত্বাবধানে তিনি quantum scattering and spectroscopy-তে পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বর্জন করে তিনি ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি *জওহরলাল নেহরু সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড সায়েন্টিফিক রিসার্চের সেন্টার ফর কম্প্যুট্যাশন্যাল ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সেসের অ্যাসোসিয়েট সদস্য।*

তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ:

Theoretical Chemistry and Chemical Physics, Classical and Quantum Monte Carlo, Molecular Dynamics, Structure and Dynamics of Liquids, Water and Hydration, Nucleation, Self-assembly.

নির্বাচিত প্রকাশনার তালিকা:

1. Agarwal, M., Singh, M., Jabes, S. B., and Charusita Chakravarty, *Excess entropy scaling of transport properties in network-forming ionic melts (SiO2 and BeF2).* J. Chem. Phys. 2011, 134, 014502
2. Sharma, R., Agarwal, M. and Charusita, C. *Estimating the entropy of liquids from atom-atom radial distribution functions: silica, beryllium fluoride and water.* Mol. Phys. 2008, 106, 1925.
3. Agarwal, M. and Chakravarty, C. *Waterlike structural and excess entropy anomalies in liquid beryllium fluoride.* J. Phys. Chem. B, 2007, 111, 13294.
4. Sharma, R., Nath, Chakraborty, S. N. and Charusita C. *Entropy, Diffusivity and Structural Order in Liquids with Water-like Anomalies.* J. Chem. Phys. 2006, 125, 204501.
5. Mudi, A.; Chakravarty,C. *Multiple Time-scale Behaviour of the Hydrogen Bond Network in Water.* J. Phys. Chem. B, 2004, 108, 19607. Medal for Young Scientists (1996)

• সমাপ্ত

তপন চক্রবর্তী শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক ও চিকিৎসক

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd, b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

শুভেচ্ছা

জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মাসুদ করিম

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, এই নাম উচ্চারণমাত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিশাল রূপালি পর্দা-কাঁপানো এক অসাধারণ অভিনেতার মুখ যিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত অভিনেতাদের নামের তালিকায় নিজেকে যুক্ত করেছেন।

তাঁর জন্ম নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে হলেও আদি নিবাস ছিল অবিভক্ত ভারতের নদীয়ার কুষ্টিয়ায়, শিলাইদহ থেকে আটমাইল দূরে কয়া গ্রামে। এই গ্রামেই জন্মেছিলেন বিপ্লবী বাঘা যতীন। যা হোক, সৌমিত্র একবার গিয়েছিলেন সে গ্রামে। বাল্যশিক্ষা কৃষ্ণনগরে শুরু হলেও পিতার বদলির চাকরিসূত্রে তাই কখনো বারাসত, কখনো হাওড়া, কখনো দার্জিলিং-এ তাঁর শিক্ষাজীবন কাটে। বাড়িতে বইপড়া, আবৃত্তিচর্চার রেওয়াজ ছিল। বাবা আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরা হয়ে পুরস্কৃতও হন। এই পারিবারিক পরিবেশ আর কৃষ্ণনগরের নাগরিক সুবাতাসে সৌমিত্রর বাল্যজীবন কাটে। পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে তিনি জীবনে প্রথমবারের মত মঞ্চে নামেন অভিনয় করতে। তারপর থেকে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে অভিনয় করে যাচ্ছেন।

শৈশবে একাকীত্ববোধ কাজ করত খুব। কৃষ্ণনগরের নিজস্ব নদী জলঙ্গীতে খেয়া ভাসিয়ে বালক সৌমিত্রর নদী-পারাপার ও সমবয়সীদের সঙ্গে দুরন্তপনা করে সময় কাটত। স্কুলে হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ন সৌমিত্র 'তরুণ সংঘ' নামে স্থানীয় ক্লাবে নাটক মঞ্চস্থ করতেন।

১৯৫৮ সাল সৌমিত্রর জীবনে টার্নিং পয়েন্ট। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে এখানে-ওখানে খুচরো চাকরি, আকাশবাণী কলকাতায় যোগ, ঘোষকের চাকরি।সহকর্মীদের মধ্যে বিকাশ রায়, হারাধন বঙ্গোপাধ্যায়, অসিতবরণ প্রমুখ।

অভিভাবক হিসেবে সেখানে পান বাবার সহপাঠিনী লীলা মজুমদারকে, যাঁকে পিসি ডাকতেন সৌমিত্র। ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। এর কিছুকালবাদেই তিনি এলেন একেবারে নতুন দেশে, চলচ্চিত্রের অভিনেতা হয়ে, সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে। ছবির নাম *অপুর সংসার*, বিপরীতে শর্মিলা ঠাকুর।

সত্যজিৎকে তিনি প্রথম দেখেন সিনেট হলে, *পথের পাঁচালী*র সাফল্যে তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। ১৯৫৮ সালের ৯ আগস্ট সৌমিত্রর কাছে অবিস্মরণীয় দিন, সত্যজিতের ছবিতে সৌমিত্র এদিন প্রথম ক্যামেরার মুখোমুখি হলেন। তাঁর প্রথম ছবি, সত্যজিৎ রায়ের পঞ্চম। তারপর তো দুই দীর্ঘদেহীপুরুষ, সত্যজিৎ ও সৌমিত্র, দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে বাংলা চলচ্চিত্রকে নান্দনিক সাফল্যের এক চূড়া থেকে আরেক চূড়ায় নিয়ে গেছেন। সত্যজিৎ রায়ের চোদ্দটি ছবির নায়ক সৌমিত্র। তাছাড়া, তাঁর দু'টি তথ্যচিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন।

১৯৫৯ সালে তিনি সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় *অপুর সংসার* ছবিতে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলোর মাঝে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং দর্শকসমাদৃত হল ফেলুদা। তিনি সত্যজিৎ রায়ের *সোনার কেল্লা* এবং *জয়বাবা ফেলুনাথ* ছবিতে ফেলুদার ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকহৃদয়ে স্থায়ীভাবে স্থান করে নিয়েছেন।

চলচ্চিত্র ছাড়াও তিনি বহু নাটক, পত্রিকা সম্পাদনা, আবৃত্তি, এমনকি যাত্রাসহ টেলিভিশনের ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন। এর বাইরে মঞ্চ নাটকেও আছে তাঁর পদচারণা। এই অসাধারণ অভিনেতার নামের আগে কবি দেখলে অনেকেই চমকে উঠবেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যথার্থই একজন কবি। বাংলা কবিতার তিরিশের দশকের ঐতিহ্যের পথ ধরে যে আধুনিকতার ঠিকানা, সেই আধুনিক ধারাতেই অনেক মনকাড়া কবিতা লিখেছেন তিনি। একজন বাঙালি হিসেবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর জীবনের প্রায় পুরোটাই বিলিয়ে দিয়েছেন বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য। তাই একজন অভিনেতা হিসেবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিখ্যাত পরিচালক মৃণাল সেন যথার্থই বলেছেন, 'বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে আরো বেশি উজ্জ্বল হচ্ছে'। তিনি তাঁর রক্ত-মাংসে চলচ্চিত্রকে ধারণ করেন একজন শক্তিমান অভিনেতা হিসেবে। তাঁর অভিনীত কিছু কিছু চরিত্র দেখে ধারণা করা হয় যে, তাঁকে মাথায় রেখেই গল্প বা চিত্রনাট্যগুলো তৈরি। দীর্ঘদিন ধরে নিরন্তর ছবিও এঁকে চলেছেন। ২০১৪-র ১৯ জানুয়ারি তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতার একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়। এরপর *আনন্দ পাবলিশার্স থেকে তাঁর কবিতাসমগ্র* বের হয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করে।

পদ্মভূষণ, সংগীত-নাটক একাডেমি, দাদাসাহেব ফালকেসহ অজস্র পুরস্কারে ভূষিত এই কিংবদন্তি অভিনেতা ২০১৬ সালের ১৯ জানুয়ারি একাশি বছর অতিক্রম করেছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে গত বছর আমি তাঁর জীবনভিত্তিক তথ্যচিত্র *কৃষ্ণকলি* নির্মাণ করেছি। এতে সময় লেগেছে পুরো এক বছর। এই তথ্যচিত্রে সৌমিত্রবাবুর অনেক অজানা কথা জানা গেছে যা তিনি পূর্বে কখনও বলেননি বা প্রকাশ করেননি।

২৮ এপ্রিল ২০১৫ এই তথ্যচিত্রটির প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়– সৌমিত্রবাবু স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রেও এর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আমার অনুরোধে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রতীক্ষা ও ভালোবাসার কবিতার* বাছাই করা ১১টি কবিতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আবৃত্তি করেন। ১৯ জানুয়ারি তাঁর একাশিতম জন্মদিনে আমাদের ভালবাসা আর শ্রদ্ধাঞ্জলি। জয়তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

মাসুদ করিম কবি, সম্পাদক *কলাবাগান বার্তা*

ছোটগল্প

যোদ্ধা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কলিংবেলের শব্দ শুনে আমি নিজেই গিয়ে দোর খুললাম। মুখে কিছু বিরক্তির ছাপ এসে থাকবে। কারণ একটি লেখা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ধ্বস্তাধস্তি করছিলাম। বাইরের তাগিদের সঙ্গে অন্তরের তাগিদ কখনো মেলে না। এই গরমিল আর গোঁজামিল নিয়েই কাউকে কাউকে সারা জীবন কাটিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু দোর খুলে একজন প্রিয় পরিচিত ভদ্রলোককে দেখে আমার মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। হেসে বললাম, 'আরে প্রাণগোপালবাবু যে! আসুন আসুন।'

প্রাণগোপাল একটু হেসে বললেন, 'ডিস্টার্ব করলাম না তো?'

আমি বললাম, 'আরে না না না।'

প্রাণগোপাল বললেন, 'খুব মন দিয়ে লিখছিলেন। আমি আসতে আসতে জানলা দিয়ে দেখলাম। একবার ভাবলাম ফিরে যাই। এই সময় আপনাকে ডিস্টার্ব করা ঠিক হবে না। আর একবার ভাবলাম এতদূর থেকে এসেছি, আবার কবে আসব তার ঠিক নেই, মোটেই আসা হবে কিনা তা-ও অনিশ্চিত। এলামই যখন একটু দেখা করে যাই। দুটো কথা বলে যাই।'

আমি বললাম, 'বেশ করেছেন। এইটুকু না করলেই অন্যায় হত।'

তাঁকে আমি সাদরে বসতে দিলাম। কাঁধের রঙীন ঝুলিটি মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে তিনি সোফার ওপরে বেশ একটু আরাম করেই বসলেন। আমি চেয়ার থেকে নেমে এসে আর এটি সোফার ধারে বসে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

প্রাণগোপাল একটু হেসে বললেন, 'বিধুমুখের মধুর হাসি দেখতে বড়ই ভালোবাসি। আমি তাই দেখতে আসি দেখা দিতে আসিনে। নিধুবাবুর গান। এই নিষ্কাম প্রেম কোন কোন সময় চলে। সব সময় চলে না। দেখা না দিতে পারলে শুধু দেখে যাওয়াটা অসম্পূর্ণ। The circle remains incomplete.'

আমি বললাম, 'তা ঠিক। কেমন আছেন বলুন।' তিনি বললেন, 'আপনার এখানে যখন আসতে পেরেছি, বসে কথা বলতে পারছি বলতেই হবে ভালো আছি। স্পুটাম এখন নেগেটিভ। কাসি-টাসি নেই। রোগের যন্ত্রণা বেশি বোধ করিনে। ভালো আছি কল্যাণবাবু।'

আমি চুপ করে রইলাম। আমার এই বন্ধুটি দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে কি তারও বেশি টি বি-তে ভুগছেন। নানা হাসপাতালে কি স্যানাটোরিয়ামে তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে। টি বি আজকাল দুরারোগ্য নয়। কিন্তু কি একটা চিকিৎসা বিভ্রাটে কিছুতেই আর নীরোগ হতে পারেননি। শক্ত সমর্থ কর্মক্ষম হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বোধহয় কোনদিন আর তা হবে না।

বছর পঞ্চাশেক বয়স হয়েছে প্রাণগোপালবাবুর। যৌবনে সুপুরুষ ছিলেন তা এখনো বোঝা যায়। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। দীর্ঘাঙ্গও। টানা নাক, আয়ত চোখ। পাতলা ঠোঁট, চিবুকে একটু খাঁজ আছে। তাতে ভালোই দেখায়। কিন্তু এই অতুল রূপের ঐশ্বর্য নিয়ে চিররুগ্ন মানুষটি চিরদরিদ্র হয়েই রইলেন।

কিছুদিন ওঁর মুখে দাড়ি দেখেছি। উনিশ শতকী দাড়ি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনেককেই মানায় না। কিন্তু ওঁকে মানাত। ওঁর মুখের গড়নের সঙ্গে কালো চাপদাড়ি বেশ খাপ খেয়ে যেত। এবার দেখলাম সেই দাড়ি উনি চেঁছে ফেলেছেন। নিখুঁতভাবে পরিচ্ছন্ন মুখমণ্ডল।

গায়ে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি। পরণে মিহি ধুতি। সেই ধুতি পাড়হীন নয় কালো রঙের ফিতেপাড় আছে।

দেখেই মনে হয় ভদ্রলোক সচ্ছল সম্পন্ন না হলেও সৌখিন। পায়ে ব্রাউন রঙের নিউকাট, নতুন নয় কিন্তু পালিশ করা। মাথার চুলে পাক ধরেনি। বেশ চুল আছে মাথায়। সেই ঘন আর কালো চুল যত্ন করে আঁচড়ানো। মিষ্টি মশলা দিয়ে পান খাওয়ার অভ্যাস আছে। তারই ক্ষীণ সৌরভ যেন বাতাসে লেগে রয়েছে।

ভদ্রলোকের গলার স্বর মিষ্টি, কথা বলবার ভঙ্গিটিও মনোরম। সেই স্বর অনুচ্চ। কিন্তু একটানা ক্লান্তিকর নয়। প্রাণগোপালের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিসের একটা প্রসন্ন মাধুর্য আমি অনুভব করেছি। এই রোগভোগের পরেও এমন মেজাজ তিনি কী করে বজায় রেখেছেন ভেবে অবাক হয়েছি। এই গুণ তাঁর কি স্বভাবজ না একে তিনি যত্ন করে আয়ত্ত করেছেন? আয়ত্তে রেখেছেন? স্বভাবের যে গুণ তাও ধরে রাখতে না জানলে পরস্ব হয়ে যায়।

বহুদিন পরে বোধহয় বছর তিনেক বাদে আমাদের বাড়িতে এলেন প্রাণগোপাল চৌধুরী। ওঁকে দেখছিলাম আর মনে হচ্ছিল এত রূপ এত রুচি এত গুণ– কিন্তু সবই এক মহাব্যাধিতে আক্রান্ত। কীটদষ্ট কুসুম উপমাটি পুরনো। নতুন উপমা খুঁজছিলাম কিন্তু মাথায় আসছিল না।

প্রাণগোপাল একটু হেসে বললেন, 'আপনি বোধহয় লেখার কথা ভাবছেন। লেখকদের সঙ্গে কথা বলায় এই এক বিপদ। তাঁরা কখন যে অন্য জগতে চলে যান সাধারণ মানুষের টের পাওয়ার উপায় নেই।'

আমি একটু লজ্জিত হলাম। আমার অন্যমনস্কতা কি ওঁর কাছে ধরা পড়েছে? যে মুহূর্তে আমি একটি নতুন উপমা খুঁজছিলাম তখন আমি ঠিক ওঁর কথা শুনছিলাম না। আমার যে চোখ ওঁর দিকে তাকিয়েছিল তাতে দৃষ্টি ছিল না। সেই শূন্যদৃষ্টি কি ওঁর চোখে ধরা পড়েছে?

একটু হেসে বললাম, 'আমি কিন্তু আপনার কথাই ভাবছিলাম।'

প্রাণগোপাল বললেন, 'মানে আমাকে নিয়ে লেখার কথা। আমার কথা ভাবা আর আমাকে নিয়ে লেখার কথা ভাবা কিন্তু এক জিনিস নয় কল্যাণবাবু। যেমন একটি মেয়েকে ভালোবাসা আর সেই ভালোবাসা নিয়ে গল্প লেখা এক নয়।'

হেসে আমার মুখের দিকে তাকালেন প্রাণগোপাল। তারপর বললেন, 'এবার চলি। দেখা হল কথা হল। এমন কি ভালোবাসার কথাও হয়ে গেল। এবার আমি বিদায় নিই। আপনি বসে বসে লিখুন।'

কিন্তু আমি তাঁকে অত সহজে ছাড়লাম না।

হেসে বললাম, 'তাই কি হয়। আপনি বছরদুই বাদে এলেন। কিছুক্ষণ বসুন চা-টা খান, তারপর যাবেন।'

তিনি বললেন, 'চা একটু খেতে পারি। কিন্তু আর কিছু নয়।'

অমি অন্দরমহলে গিয়ে দু'কাপ চা করবার কথা বলে এলাম।

প্রাণগোপাল বললেন, 'গল্প করতে তো ভালই লাগে। কথা বলবার মানুষ এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু আপনার কাজের কোন ক্ষতি হচ্ছে না তো?'

আমি বললাম, 'না, না আমি অকাজের মানুষ। কর্মজগতের বাইরের লোক।'

প্রাণগোপাল বললেন, 'তাই কি আর হয়? আপনি কুড়ুল ধরেন না, কোদাল ধরেন না তাই বলে কি আর কোন কাজ করেন না? সে কথা বরং আমি বলতে পারি। যে কাজ করার আমার ইচ্ছা ছিল তা করা হয় না। রোগ আমাকে অকর্মা করে রাখল।'

এটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আপনার কৈফিয়ৎ আছে। সমাজ-সংসারের কাছে আপনার কোন জবাবদিহি নেই। কিন্তু আমরা যারা সুস্থ থেকেও কিছু করে উঠতে পারলাম না তাদের সান্ত্বনা কোথায়?

প্রাণগোপাল একটু হাসলেন, 'সুস্থ থাকা, নিজের দেহমনকে সুস্থ রাখতে পারাও যে কত বড় কৃতিত্ব তা আমি বুঝব না!'

আমার স্ত্রী চা নিয়ে এলেন।

প্রাণগোপাল নিজের থলির ভিতর থেকে একটি কাপ বের করে বললেন, 'আমার চা এতে ঢেলে দিন।'

এই অভ্যাস তাঁর দীর্ঘদিনের। নিজের কাপে করে চা খান। নিজের সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে সব সময় সচেতন।

আমার স্ত্রী বললেন, 'শুধু চা-ই খাচ্ছেন? আর কিছু খেলেন না?'

তিনি স্মিতমুখে বললেন, 'না আর কিছু খাব না। যখন-তখন খেলে সহ্য হয় না।'

'আপনি কি এখনো কাঁচড়াপাড়ায় আছেন?'

তিনি বললেন, 'না, না। কাঁচড়াপাড়া অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। ওঁরাই ছাড়িয়ে দিয়েছেন।' হাসলেন প্রাণগোপাল।

'এখন তাহলে আছেন কোথায়?'

তিনি বললেন, 'আছি গড়িয়াহাটায়। এক ভদ্রলোকের বাইরের ঘরে। তবে ওখানেও বেশি দিন আর থাকব না।'

বললাম, 'কোথায় যাবেন?'

তিনি বললেন, 'তা তো জানি নে।'

এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়ে তিনি চায়ের কাপটি ধুয়ে আবার থলির ভিতর ভরে রাখলেন। গৃহিণী গৃহকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

প্রাণগোপাল আমার ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন দেখলেন। কোন গৃহস্থের সংসারে এসে এই অনিকেত মানুষটির মনে কী ভাবের উদয় হয় আমি অনুমান করতে চেষ্টা করলাম।

হঠাৎ প্রাণগোপাল বললেন, 'স্বাস্থ্য যে কী বস্তু যাঁরা স্বাস্থ্যবান তাঁদের তা বোঝানো যাবে না। রোগ যে কত বড় দুর্ভাগ্য তা শুধু রোগীরাই জানে। রোগীরা বললাম– কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই একজন রোগী আর একজন রোগীর কষ্ট বুঝতে পারে না। রোগ মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে। দারুণ স্বার্থপর। নিজেকে ছাড়া সে আর কাউকে চেনে না। রোগ– রোগ মানুষকে শরীরসর্বস্ব করে তোলে। এই শরীর তার ভোগের নয়, সুখের নয়, পঙ্গু ব্যাধিগ্রস্ত যন্ত্রণার আধার এই শরীর এর ওপরও তার কি মমতা।'

প্রাণগোপাল একটু থামলেন। তারপর হেসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু সব সময় নয়। সবার বেলায় এ কথা সত্য নয়। এই জীর্ণ বাস ত্যাগ করার জন্যেও যে কেউ কেউ কী মরিয়া হয়ে ওঠে তা আমি জানি। আপনি ভাবতে পারেন একটি খুনীকে আমি নিজের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছি।'

এমন একজন প্রসন্ন প্রশান্ত সুদর্শন ভদ্রলোকের মুখ থেকে এ কথা শুনলে তা অবশ্য বিশ্বাস করা কঠিন।

বললাম, 'আপনি কাকে খুন করতে চান?'

তিনি বললেন, 'কাকে আবার? নিজেকে খুন করাই তো সবচেয়ে সহজ। এই শত্রুকেই তো আমি সবচেয়ে বেশি করে জানি। কোথায় তার যাতায়াত, কি ধরনের তার চলাফেরা, কোথায় তার দুর্বলতা আমার চেয়ে

বেশি আর কে জানে।'

হেসে বললাম, 'তবু তো নিজেকে খুন করতে পারেননি।'

তিনি বললেন, 'না পারিনি। কিন্তু চেষ্টায় আছি। সেই খুনী মানুষটি এখনো বহাল তবিয়তে রয়েছে। হত্যার চেষ্টার দায়ে কেউ তাকে গ্রেপ্তার করেনি, জেলে দেয়নি। সে ছাড়াই আছে। ঝোপ দেখলেই কোপ মারবে।'

বললাম, 'কবে থেকে এই আত্মহননের ইচ্ছা আপনার মনে এসেছে?'

প্রাণগোপাল বললেন, 'সে বহুদিন আগের কথা। সাতাশ বছর আগে। তখন থেকেই আমার রোগের সূত্রপাত। বাবা-মা অনেকদিন আগেই চলে গেছেন। বেলেঘাটায় দিদি-জামাইবাবুর বাড়িতে থেকে পড়ি। জামাইবাবুর অবস্থা ভালো না। ওখানকারই এক চুনের আড়তে কাজ করেন। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হয়েছে। তার নিজেরই চলে না। তার মধ্যে আমি এসে জুটলাম উপসর্গ। অবশ্য দিদি কি জামাইবাবু কেউ আমাকে তা মনে করাতেন না। টিউশনি করে ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে আমি যা পেতাম দিদির হাতে তুলে দিতাম। তাতে তখনকার দিনে আমার নিজের খরচটা তো হয়ে যেতই, কিছু বেশিও থাকত। কলেজে বিএ ক্লাশের মাইনে ছিল তখন ছ'টাকা। আমি হাফ ফ্রি-শিপ পেয়েছিলাম। বইপত্র কিনতে হত না। চেয়েচিন্তে নিতাম। খাতার পর খাতা কপি করে করে নিজেই গ্রন্থকার হতাম। দিদি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। সংসারের ঝামেলা, গুটিছয়েক ছেলেপুলে নিয়ে অস্থির। তবু আমার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। হ্যাঁরে দিনরাত যে কেবল টিউশনি করিস তুই নিজে পড়াশুনো করবি কখন? পাশ করবি কী করে? আমি বলতাম তুমি ভেব না দিদি। হয়ে যাবে। রাত জেগে পড়তাম। দিনে ক্লাশ করতাম। কোন প্রফেসরের কোন লেকচার আমার কামাই যেত না। প্রথম যৌবনের সেই জেদ, সেই তেজের কথা ভেবে দেখুন। তখন ধারণা ছিল যত বাধা বিপত্তিই আসুক আমি একাই জয় করতে পারব। আমি আমার নিজের দারিদ্র্যকে স্বীকার করব না, আমি কারো কাছে মাথা নোয়াব না। আমি কারো চেয়ে কম কিসে? তখন আমি একাই এক অক্ষৌহিণী। তখনো আসলে আমার কোন সম্বলই ছিল না। Naught had I, yet enough I had। সেই সময় একদিন আমার গলা দিয়ে রক্ত পড়ল জ্বর হল কাশি হল। জামাইবাবু ডাক্তার ডেকে আনলেন। তিনি মুখ ভার করলেন। তিনি এক্সরে করাতে বললেন। কারো হাতেই তেমন টাকা-পয়সা নেই। কিন্তু উকিল ডাক্তারের টাকা ভূতে জোগায়। দেখা গেল দুটো ফুসফুসই জখম হয়েছে। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন ছেলেপুলের বাড়ি, এখানে রাখবেন না। এখান থেকে সরিয়ে নিন। কিন্তু সরাতে চাইলেই তো সরানো যায় না। হাসপাতালে ভর্তি করবার চেষ্টা চলতে লাগল। একদিন বেশি রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে দিদি আমার শিয়রে বসে কপালে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'হ্যাঁরে গোপাল, কেন এই সর্বনাশ করলি বল তো।'

'কিসের সর্বনাশ দিদি?'

দিদি বললেন, 'কেন এই রোগটা বাধালি?'

আমি হেসে বললাম, 'আমি কি ইচ্ছা করে বাধিয়েছি না কি?'

দিদি বললেন, 'তুই ইচ্ছা করেই এই সর্বনাশ করেছিস। আমি জানি কোত্থেকে তুই এই রোগ কুড়িয়ে এনেছিস।'

'কোত্থেকে?'

'বস্তির ওই মেয়েটার কাছ থেকে।'

আমি বললাম, 'রাণীর কথা বলছ? সে তো মারা গেছে দিদি?'

'শুধু মারা যায়নি আমাদের গুষ্টিশুদ্ধ সবাইকে মেরে গেছে। আমি কতবার তোকে বারণ করেছি তুই যাসনে। ওই সব রোগ ব্যাধির মধ্যে যাসনে। কিন্তু আমার কথা তো শুনলি নে সর্বনাশ ডেকে আনলি। এখন কি উপায় হবে ভগবানই জানেন।'

সেদিন কাশি ছিল না, জ্বর ছিল না। তবু সারারাত আমার ঘুম হল না। আমার দিদি এত স্নেহময়ী তবু সেদিন আমার মনে হল তার নিষ্ঠুরতার যেন শেষ নেই। রানী নামে সতেরো-আঠারো বছরের একটি মেয়েকে আমি পড়াতাম ঠিকই। ওর বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন ওরা ভালো বাড়িতেই থাকত। আমি মাইনেটাও নিয়মিত পেতাম। তারপর ভদ্রলোক হঠাৎ মারা গেলেন। দেখা গেল কিছুই রেখে যেতে পারেননি। ওরা চলে এল বস্তিতে। ওর মা সেলাই-টেলাইয়ের কাজ পারতেন। কোন রকমে কষ্টে-সৃষ্টে চলতে লাগল। রানীর আরো দুটি ভাই-বোন ছিল। আমার টিউশনিটি গেল কিন্তু আমি যেতে পারলাম না। জামাইবাবু যেমন সংসারের কর্তা আমিও তেমনি ওদের সংসারের কর্তা না হোক উপদেষ্টা হয়ে উঠলাম। আপদে বিপদে ওরা আমাকে ডাকেন। আমার তখন কীই-বা ক্ষমতা কিন্তু মনের ভাবখানা এমন আমি যেন বিশ্বভুবনের ভার বইতে পারি। সারা পৃথিবীর দুঃখ বুকে করে ঘুরে বেড়ানোর শক্তি যেন আমার কাছে। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দু'-পাঁচ টাকা ওদের দিতাম। তা-ও নগদ টাকা নয়। তরি তরকারি কিনলাম হয়তো ফলটা মূলটা দিলাম। রানীর জান্যে দু'-একবার যে সাবান স্নো না কিনেছি তা-ও নয়। এইটুকু পেয়ে ওরা যে কী কৃতজ্ঞ ছিল, কত যত্নই যে আমায় করত তা আপনাকে বলতে পারব না। সেই যে কথায় আছে মেয়েরা যাদের ভালোবাসে মাথার চুল দিয়ে তাদের ভিজে পা মুছিয়ে দেয় আমি রানীর কাছ থেকে সেরকম যত্নই পেয়েছি। সেই রানীর যখন অসুখ করল আমি কী করে দূরে সরে থাকি কিন্তু দিদি তা সহ্য করতে পারতেন না। জামাইবাবুকেও আড়ালে আবডালে বলতে শুনেছি, এই সেরেছে। গরীবকে ঘোড়া রোগে ধরেছে। এই বয়সেই যদি মেয়েদের পাল্লায় পড়ে আর রক্ষা নেই।

রানী বেশিদিন বাঁচল না। মাসছয়েক ভুগে মারা গেল। গায়ের গয়না বিক্রি করে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে ওর মা চিকিৎসা করিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। দিদি যেমন আমার মাথায় হাত বুলান আমিও তেমনি রানীর বিছানায় বসে ওর কপালে মাথায় হাত বুলিয়েছি। সামান্য সেবা-শুশ্রূষা করেছি। কিন্তু কই আমার জন্যে দিদির তো কিছু হয়নি। যত দোষ বুঝি রানীর। আমি তখন ভাবতাম রানী আমাকে একদিন বলেছিল, 'আমি আর বাঁচব না তা জানি। কিন্তু তোমার জন্যে আমার বড্ড বাঁচতে ইচ্ছা করে।'

নিজের জন্যে নয় একজনের জন্যে আর একজনের বাঁচবার ইচ্ছা। বেশি বয়সে বহু রোগযন্ত্রণা ভোগ করবার পর এই ইচ্ছারও আমি কূট ব্যাখ্যা করেছি। সুখও আসলে আত্মসুখ। এও স্বার্থপরতা। কিন্তু সেদিন আমার মনে হয়েছিল অমন মধুরতম কথা পৃথিবীতে কেউ কোনদিন শোনেনি, কেউ কোনদিন উচ্চারণও করেনি। যে অমন অমৃতধারা ঢেলে দিতে পারে তার জন্যে বুঝি সব দেওয়া যায়। কিন্তু ভাববেন না আমি অসংযত হয়েছিলাম। স্বাস্থ্যবিধি ভেঙে ফেলেছিলাম। রানীই আমাকে তা ভাঙতে দেয়নি। আমি কখনো যদি কোনদিন সামান্য চঞ্চল হয়েছি ও আমাকে নিবৃত্ত করেছে।

সেই রানীকে দিদি সন্দেহ করায় আমার মনে খুব রাগ হল, ক্ষোভ হল। আমি কাউকে কিছু না বলে কালীঘাটের একটা সস্তা মেসে গিয়ে উঠলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম আমার অসুখ হওয়ার পর থেকে দিদি-জামাইবাবুর আমার ভাগ্নে-ভাগ্নীদের মনোভাব বদলে গেছে। ওরা আর চাইছে না আমি ওখানে থাকি। কেমন একটা ভয় আশঙ্কা সব সময় ওদের চোখে মুখে আমি দেখতে পেতাম। ওদের দোষ দেওয়া যায় না। কতদিন আগের কথা। তখন টি বি সম্বন্ধে সংস্কার তো আরো অনেক বেশি ছিল।

সংক্রামক রোগ নিয়ে মেসে থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমি তখনই ঠিক করে ফেলেছিলাম আমি বেশি দিন থাকব না। খুবই অল্প দিনের মেয়াদে আমি এসেছি। অল্প অল্প করে আমি আফিং সংগ্রহ করতে লাগলাম। পাশের বাড়ির হিন্দুস্থানী দারোয়ানের সঙ্গে আমি ভাব করে নিলাম। সে শুধু খৈনিই খায় না, আফিং-এরও গোপন ব্যবসা করে আমি জানতাম। সেই আমাকে সুবিধা করে দিল। তারপর আমার দুই রুমমেট যখন রাত্রে সিনেমা দেখতে বেরোল আমি ঘরে খিল এঁটে আফিং খেলাম। রাত বারটার সময় মেসের লোকজন দোর ভেঙে আমার সেই ঘরে ঢুকেছিল। তারা ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করিয়ে আমাকে তখনকার মত সুস্থ করে তুলেছিল। আমার দুই রুমমেটও ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বাকি রাখেনি। তেঁতুল গোলা খাইয়ে আমাকে বমি করিয়েছিল, চুল ধরে টেনে টেনে সারা মাথায় আমার ব্যথা করে দিয়েছিল। পরদিন সকালে দিদি এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'তোকে জেলে দেওয়া উচিত।'

বহুদিন আমার গায়ের রঙ নীল হয়ে ছিল। কেন যে সেদিন মরলাম না কে জানে। এই সব ঘটনা আমাদের দৈবে বিশ্বাস এনে দেয়। দৈব যেমন দুর্ঘটনা ঘটায়, দুর্ঘটনা থেকে বাঁচায়ও। হয়তো আফিং-এর মাত্রা যথোচিত হয়নি। হয়তো সময়মত ডাক্তার এসে পড়েছিলেন তাই সেবার রক্ষা পেয়েছিলাম। অথচ তখন আমি ঠিক রক্ষা পেতে চাইনি। কেন বাঁচব, কিসের জন্যে বাঁচব? একজন বলেছিল, 'তোমার জন্যে আমার বাঁচতে ইচ্ছা করে।' আমার তো তেমন কেউ নেই। আমি তো কাউকে বলতে পারিনে, 'তোমার জন্য আমার বাঁচতে ইচ্ছা করে।' নিজের জন্যেও আমার সেদিন

বাঁচবার ইচ্ছা ছিল। সেই শুরুতেই আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল আমার রোগের ভালো করে চিকিৎসা হবে না, আমার সেই সাধ্য নেই। আমি যতদিন বাঁচব কয়েকটি আপনজনের ঘাড়ে বোঝা হয়ে থাকব। আর তারা দিনে দিনে পর হয়ে যাবে। ভুগে মরার চেয়ে নিজের হাতে নিজের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া অনেক ভালো। নিজেকে সেদিন খুন করতে পারিনি। কিন্তু মারাত্মক রকমে জখম করে দিয়েছিলাম। তার জের বেশ কয়েক বছর ছিল।

তারপর হাসপাতালে ভর্তি হলাম। চিকিৎসাদি চলতে লাগল। দেখলাম আমার মত বহু রোগীতে বেডগুলি ভরতি। কতজনের আমার চেয়েও কত খারাপ অবস্থা। তারা আরো সহানুভূতির যোগ্য। আমার জীবনের ওপর মমতা ফিরে এল। সেই সময় আমি কিছু পড়াশুনাও করলাম। কলেজের পরীক্ষা দেওয়া আর হল না। ইংরেজি বাংলা যেটুকু যা পড়েছি পাঠ্য তালিকার বাইরে। টি বি রোগ সম্বন্ধেও পড়াশুনা করেছি। সহজপাঠ্য সাধারণের বোধ্য একখানা বইও তা নিয়ে লিখেছিলাম। তার এক কপি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম। জানি না আছে কিনা। দেশের বিদেশের যে সব কবি সাহিত্যিক টি বি-তে ভুগেছেন মারা গেছেন তাঁদের জীবন আমাকে আকর্ষণ করত। তাঁদের জীবনের উপাখ্যান নিয়েও আমার একখানা চটি বই আছে। হয়তো পড়ে থাকবেন। একখানা উপন্যাসও লিখেছিলাম। কিন্তু আশানুরূপ হয়নি। সবাই কি সব পারে? শুধু চেষ্টাই করা যায়। তবু নিজের কাছে নিজের সেই উদ্যমটুকু ভাল লাগে। সেই উদ্যমই হল জীবন। তারই মধ্যে সাফল্যের সমস্ত সম্ভাবনা। আবার সাফল্যের মরীচিকা যে আছে সে কথাও সত্য। ছলনা শুধু হাতছানিই দেয়, হাতের মধ্যে হাতখানা নিয়ে ধরে রাখে না। তারপর আবার আমাকে মরণের নেশায় পেয়ে বসল যখন শুনলাম ডাক্তারদের চিকিৎসার ভুলে আমার চরম সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি আর কোনকালেই সুস্থ হয়ে উঠব না তখন আবার আমি নিজেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম।'

বললাম, 'চিকিৎসা বিভ্রাটটা কি?'

প্রাণগোপাল বললেন, 'সে সব আপনাকে বলতে সময় লাগবে। আপনার নিশ্চয়ই সে সময় নেই। আমার হাতেও সময় অল্প। এই পাইকপাড়া থেকে আমাকে সেই গড়িয়াহাটায় ফিরে যেতে হবে। পরের বাড়িতে থাকি। বাঁধা সময়ে খাওয়া দাওয়া সারতে হয়। সেটা নিজের জন্যেও।'

বললাম, 'আপনার তো অপারেশন হয়েছিল?'

তিনি বললেন, 'হয়েছিল বইকি। কয়েকবার অস্ত্রাঘাত হয়ে গেছে। দেখবেন?'

জামা তুলে তিনি বুকের ওপর বিরাট এক অপারেশনের দাগ দেখালেন। দীর্ঘ এক ক্ষতচিহ্ন। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

তিনি হেসে বললেন, 'পিঠেও আছে।'

দেখলাম পিঠে একটি গর্ত।

বললাম, 'ওটা কি?'

তিনি বললেন, 'পাক বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে এই পয়ঃনালী। অনুমতি দিন আবার বর্ম পরি।'

গেঞ্জি আর জামায় তিনি সব ঢেকে দিলেন।

তারপর হেসে বললেন, 'কী মনে হচ্ছে? যুদ্ধ ফেরৎ কোন সৈনিক টৈনিক বলে মনে হচ্ছে না?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই। তারপর আবার কীভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন?'

প্রাণগোপাল হাসলেন, 'আর বলব না মশাই। ইনসিডেন্টগুলি আপনাকে আর বলব না। বলব আর আপনি সিচুয়েশন তৈরি করে নেবেন সে হচ্ছে না। আমার গল্প আমি নিজে লিখব। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করেছিলাম পটাসিয়াম সায়নাইড দিয়ে। আমার একটি আত্মীয়ের ছেলে সায়ান্স কলেজে পড়ত; তাকে বলেছিলাম জিনিসটা জোগাড় করে দিতে। বলেছিলাম, 'আমার ঔষধের জন্য দরকার। হাসপাতালে দেখতে এসে সে আমাকে কাগজের মোড়কে কিছু সাদা পাউডার দিয়ে গেল। খাওয়ার আগে আমি অন্য রোগীদের কাছে বিদায় নিলাম। মনে মনে বললাম পলকের চেনামুখ বলে যদি খোঁজ নেয় দেখবে সে নেই। বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি লিখলাম। দিদি তখনো বেঁচে আছেন তাঁকেও লিখলাম। ডায়েরি লিখলাম কয়েক পাতা। তারপর গভীর রাত্রে সেই পাউডার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। এবার আর কৃপণতা নয়। সবখানি খেলাম। কিন্তু ভোরে উঠে দেখলাম মরিনি। বুঝতে পারলাম আমার বন্ধু সত্যপ্রসাদ আমার সঙ্গে মিথ্যাচার করেছে। বিষের গুঁড়োর বদলে আমাকে অন্য গুঁড়ো খাইয়ে গেছে। বেঁচে গেলাম দেখে ফের আমার খুব আনন্দ হল। আমি চিঠিপত্রগুলি ছিঁড়ে ফেললাম। ডায়েরির পাতাগুলি অবশ্য রইল। আমি নতুন করে লিখতে বসলাম নতুন বই। নার্সদের সঙ্গে হেসে কথা বললাম। ঠাট্টা তামাসা করলাম এক গতযৌবনার সঙ্গে। তারপর আবার যখন মৃত্যুর ইচ্ছা জাগল আমি ভাবলাম এবার আর কোন ঘরের মধ্যে নয় এবার বাইরে কোথাও মরতে হবে। মুক্ত আকাশের নিচে। চেষ্টা করেছিলাম রেললাইনের উপরে মাথা পাততে। পেতেও ছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য এক বুড়ো ভদ্রলোক দেখতে পেয়ে আমাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টাও ছিল। কিন্তু পারিনি। সেখানেও ধরা পড়ে গেছি। কার জন্য বাঁচতে চাই? নিশ্চয়ই সে কোন নারী নয়। নারীস্বরূপিণী এই পৃথিবী। বিপুলা পৃথ্বী নয়। ক্ষুদ্র-সংকীর্ণ ছোট্ট পৃথিবী যে আমার ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আছে। তার বিরুদ্ধে আমার নালিশের অন্ত নেই। সে আমাকে প্রায় কিছুই দেয়নি। অবজ্ঞা অবহেলায় আমার জীবনকে দুঃসহ করেছে। রোগে ব্যাধিতে আমাকে নিঃস্ব শক্তিহীন অকর্মণ্য করে দিয়েছে। কিছু যে একটা করে খাব তার ব্যবস্থাটুকু পর্যন্ত হয়নি। আমি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদন করেছি, গভর্নমেন্টের কাছে লেখালেখি করেছি আমার যোগ্য কাজ আমাকে দাও। নিজের পরিশ্রমের ফলটুকু আমাকে ভোগ করতে দাও। কিন্তু কোন ফল হয়নি। এখনো পরমুখাপেক্ষী হয়ে আমাকে থাকতে হয়। হয়তো বাকি জীবন তাই থাকতে হবে। লিখে টিখে পাঁচ-দশ টাকা ক্বচিৎ কখনো হয়। কিন্তু তা কি আর হিসাবের মধ্যে আনা যায়? এ সব কথা যখন ভাবি তখন আর আমার এক মুহূর্ত বাঁচতে ইচ্ছা করে না। মৃত্যুর ইচ্ছা আমাকে ধরা পড়বার ব্যবস্থা আমিই হয়তো করে রেখেছি। আমিই প্রহ্লাদের বাপ হিরণ্যকশিপু আমিই প্রহ্লাদের রক্ষাকর্তা শ্রীকৃষ্ণ। এখন স্লিপিং পিলের কৌটা বালিশের তলায় নিয়ে আমি ঘুমোই। মহাঘুমের ব্যবস্থা তো আমার হাতের মধ্যে। কিন্তু কেন যেন ঠিক হয়ে ওঠে না। কে যেন পরম মমতায় আমার হাতখানা চেপে ধরে। সেই হাত রানীর হাতের মত মনে হয়। দিদি যদিও বলতেন সেই সর্বনাশীই আমার মধ্যে মৃত্যুর বীজ ভরে দিয়েছে, সেই আমাকে বার বার অপমৃত্যুর দিকে টানছে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। সংক্রামক ব্যাধি আমি যে তার কাছ থেকেই পেয়েছি এমন কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, অতিরিক্ত পরিশ্রম, আলো-বাতাসহীন ঘরে পড়শীদের উনুনের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে বসবাস আরো কত কারণই তো ছিল। শুধু তাকে দোষ দিলে কী হবে। আমি এখনো শুনতে পাই সেই গলা– আমি তোমার জন্যে বাঁচতে চাই। আমি কখনো কখনো নিজের মনে সেই কথাটির প্রতিধ্বনি করি। আমি তোমার জন্যে– অনেক দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। কে যে ফিরিয়ে নিয়ে আসে আমি ঠিক জানিনে। কিন্তু ফিরে আসবার পর দু-একজন বন্ধুর সামান্য সহৃদয়তাও আমার ভালো লাগে। আকাশের দিকে তাকাই, সূর্যোদয় দেখি, সূর্যাস্ত দেখি। মরুভূমিতে চাঁদের স্বরূপ যে কি যদিও তা জানি তবু জ্যোৎস্না রাত্রে তার ফাঁদে ধরা দিই। তাকে নিয়ে কবিত্ব করি। শরীরটা একটু ভালো থাকলে পড়াশুনো করেও আনন্দ পাই। সব পুরোন লেখকদের পুরোন বই। নতুন লেখকের মধ্যে নতুন রসের স্বাদ গ্রহণের সামর্থ্য আর নেই। শরীরে কুলোয় না। তা ছাড়া উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা রুচির তো চর্চা হয়নি। কিন্তু যার কাছে যেটুকু যা পেয়েছি তাই নিয়েই নাড়াচাড়া করি। কৃতজ্ঞ মনে বলি: It is enough for me,'

প্রাণগোপালবাবু তাঁর রঙীন মণিপুরী ব্যাগটি কাঁধে নিয়ে এবার উঠে দাঁড়ালেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঈস। বারোটা। অনেক বেলা হয়ে গেল।' আমাদের বাড়িতে স্নানাহার করতে তাঁকে আগেও অনুরোধ করেছি। কিন্তু তিনি তা রাখেননি। আজও রাখলেন না।

আমি তাঁকে বাসস্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম।

সেই সাক্ষাতের পর বছরদুই কেটে গেছে। আমি তাঁর কোন সন্ধান পাইনি। তিনি আমাকে ঠিকানা দিয়েও যাননি যে খোঁজ নেব।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
ভারতের প্রখ্যাত ছোটগল্প লেখক

● অগ্রন্থিত এ গল্পটি প্রথম *বেতার জগৎ* শারদীয় ১৩৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়

বুলেট, তোমার নিজের কোন ভিন্নমত নেই

মুহম্মদ নূরুল হুদা

বুলেট, তোমার নিজের কোন ভিন্নমত নেই
হুকুমের হাতে তুমি নিরপেক্ষ নৃত্যপর
হুকুমের হাতে তুমি নিজে পর নিজেই অপর
হুকুমের হাতে তুমি প্রশ্নহীন ওজরবিহীন
হুকুমের হাতে তুমি বারংবার শুধু নাচবেই
বুলেট, তোমার নিজের কোন ভিন্নমত নেই

ট্রিগারের আজ্ঞাবহ,
বশংবদ বারুদজীবীর–
হুকুমের খাস দাস,
নিত্য ভৃত্য বিভিন্ন বিধির–
বুলেট, তোমার নিজের কোন ভিন্নমত নেই

সুরক্ষার বর্ম তুমি,
মারণাস্ত্র হননকারীর–
শিকারীর তাক তুমি
নির্বিকার হন্তারক তীর–
বুলেট, তোমার নিজের কোন ভিন্নমত নেই

একাত্তরে
আমিও বুলেট ছিলাম আমার নিজের
একাত্তরে
আমরা করেছি চাষ বুলেট বীজের
একাত্তরে বাঙালি করেছে চাষ বুলেট বীজের
দেখ, এখনো রেখেছি ধরে
এই বুকে সেই বুলেটটিকেই
বুলেট, তোমার নিজের কোন ভিন্নমত নেই

মানুষ, পশু ও পাখি, তৃণ-তরু, শস্য, জল, টিয়া
একতারা, সোনারূপা, তসবীহদানা, সাধু-মরমিয়া,
এ-বাংলার জাগ্রত ধূলির কণা মহূর্তেই বুলেটের ফণা
বাংলার পলল বুক মুক্তিযুদ্ধে বুলেটের মুক্ত আলপনা
দেখ, এখনো রেখেছি ধরে
এই বুকে সেই বুলেটটিকেই
বুলেট, তোমার নিজের কোন ভিন্নমত নেই

এখন কি শুরু হবে অন্য এক মুক্তিযুদ্ধ
মুনষের অনন্ত মুক্তির?
এখন কি শুরু হবে অন্য এক শুদ্ধিযুদ্ধ
মানুষের অনন্ত শুদ্ধির?
হোক শুরু হোক,
মানুষের নাম হোক মানুষ-আলোক।
সেই যুদ্ধে সর্বজয়ী আলো দিয়ে বুলেট বানাও
যোদ্ধা আর চিকিৎসক কাঁধে কাঁধ যাও হেঁটে যাও
সেই যুদ্ধে প্রাণী ও অপ্রাণী এসে দাঁড়াক সটান

পরাজয়হীন সেই যুদ্ধে
সকলেই গেয়ে যাক বিজয়ের গান।
পক্ষ ও বিপক্ষহীন সেই যুদ্ধ শান্তিযুদ্ধ,
সেই যুদ্ধ যুক্তিযুদ্ধ,
সেই যুদ্ধ শেষযুদ্ধ,
সেই যুদ্ধ ডাকে তোমাকেই–
বুলেট, তোমার নিজের কোন ভিন্নমত নেই

আলোর বুলেট হেনে বিদ্ধ করো মানুষ ও মানুষীর বুক
মানুষের মধ্যে যারা অমানুষ, ভালো করো তাদের অসুখ
তাদের তমসা-বুকে চাষ হোক ভালোবাসা আর পুষ্পকথা
শুদ্ধচিত্ত মানুষের বরাদ্দ তো মৃত্যু নয়, চির অমরতা
সময় সড়ক জুড়ে
অনন্তের যাত্রীরাও কথা রাখবেই–
বুলেট, তোমার নিজের কোন ভিন্নমত নেই

পেরিয়ে ব্যক্তির সীমা, দেশজাতি
মানুষ তুলবে ধরে সর্বরং মানবপতাকা,
সন্তানের মুখে মুখে স্বপ্নসত্য আঁকা,
দাঁড়াবে বিজয়ী বেশে
দিবানিশি জাতি আর জ্ঞাতি,
মানুষ করবে চাষ জলেস্থলে নভোনীলে আলোর বুলেট
মানুষ করবে চাষ শত্রু ও মিত্রের বুকে আলোর বুলেট
আলো দিয়ে বানাবে বুলেট, ভালো দিয়ে বানাবে বুলেট
বিজয়ী ব্রহ্মাস্ত্র তুমি হে বুলেট
তুমি ছাড়া বিজয়ের অন্য অস্ত্র নেই
সেই অস্ত্রে সুসজ্জিত মানুষেরা
নিজের বিজয় নিজে ধরে রাখবেই–
বুলেট, তোমার নিজের কোন ভিন্নমত নেই...

জন্মদাগবৃত্তান্ত

ইলিয়াস বাবর

মানবিক আত্মীয়তায় ক্রমশ ধেয়ে আসে কুয়াশাসিরিজ
ঝাপসা হতে থাকা দ্বন্দ্বমুখর সময়ের কার্নিশে বসে
খুঁজতে থাকি মানুষের ফসিল...

সেই সব মেঠোপথ এখন কাঁদে–
পিচঢালা সড়কের জ্যামময় বোঝা আলগা হতে হতে
রেকর্ডিং বাঁচিয়ে দেয় ক্যানভাসারের স্বরকষ্ট!

সম্পর্কগুলো এভাবে হাসে বিপ্রতীপ
অভাগার হাওলাগীতি মিস করে, কারা যেন–
নৃতাত্ত্বিক হবে বলে সিভি জমা দেয় ডেভলপার কোম্পানির দফতরে
কেউ কেউ খুঁজে পায় বাপ-দাদার কবরখানার নকশা!

কিছুই দেখা যায় না আর–
ভুল নামতায় গুণ-ভাগের জটিল সমীকরণের চলক
মুনাফার হার সমুখে রেখে ঘোষণা করে ইশতিহার

আর সবকিছু কুয়াশা ভরা–
শুধু জেগে আছে– জন্মদাগ!

ফিরে তুমি এসো না

কবির-আল চপল

তুমি চলে গেছ আমাকে কাঁদিয়ে
বহু দূর দূরান্তে, অজানারই দেশে
প্রেমিকের হাত ধরে।
ফিরে আর এসো না কভুও তুমি
স্বপ্নপরী হয়ে এসো না আমার ঘুম ভাঙাতে
চাঁদ হয়ে জ্বেলো নাকো আলো
জোছনা রাতের বেলা।
প্রজাপতি হয়ে ওড়াউড়ি কোরো না
আমার কাননের পুষ্পমঞ্জরিতে
ভ্রমর হয়ে শুনিয়ো না আমায় গান
গুনগুনিয়ে মাঝরাতে।
তোমার ভালবাসার আগুন
বুকের গহীনে কবর দিয়ে আমি সুখেই আছি
এ সুখের আলো নেভাতে
ফিরে তুমি এস নাকো
আর কোন দুপুরে বা রাতে।

বাহানা

শিকওয়া নাজনীন

চৌকাঠের ওপারে
নথিপত্র হাতে নিয়ে
নত মস্তকে শান্তভাবে অপেক্ষমাণ সে।
ধীর, স্থির, অথচ অনড়।
ভীত আমি
দেখেও না দেখার ভান করছি,
আর থেকে থেকে করছি মিনতি।
ফিরে যাও তুমি, ফিরে যাও,
দোহাই তোমার–
যাবার যে এখনও
সময় হয়নি আমার।

এই তো সেদিনও প্রার্থনা করেছি,
প্রতিষ্ঠিত হোক আমার সন্তানেরা
আমার স্নেহের ছায়ায়।
তারপর ডাক এলে
হাসি মুখে যাব চলে,
কিঞ্চিৎ দ্বিধা করব না আর।

হায়রে বিধাতা!
মানুষের চাহিদার যেন অন্ত নাই।
চাহিদা যখনই পূর্ণ হল
নতুন চাহিদা হৃদয় মাঝে ঠাঁই করে নিল।
আমার আদরের বংশধরেরা যখন
হেসে লুটোপুটি খায় আমারই কোলের মাঝে
কি যেন এক সুখ-অনুভূতিতে
দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসে
মনে হয়–
আমার প্রয়োজন এখনও আছে।
ওদের নরম তুলতুলে হাত ধরে
সঠিক পথে চালিত করব আমি
পথ-প্রদর্শক হয়ে।
ওরা বেড়ে ওঠা পর্যন্ত
না হয় থাকি।

এখনও যে ঢের কাজ বাকি।
প্রতিদিন তাই–
আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার
নতুন বাহানা খুঁজি।
‘ফিরে যাও তুমি মুক্তিদূত।
সময় যে হয়নি এখনও আমার
আরও কিছুটা দিন থাকি।’।।

বিষয় প্রেম

নমিতা চৌধুরী

যখন ভেবেছি দেব মুঠোভর্তি যুঁইফুল তোমার দু'হাতে
সরিয়ে নিয়েছ হাত। দিনের কর্কশ থাবায় থমকে যাচ্ছে
যানবাহন। মস্তিষ্কের কোষে অবিরাম সাইরেন-ঝড়

লক্ষ মুদ্রায় ভাঙি তাল লয়। সব কিছু চুরমার করি।
রক্তাক্ত দশটি আঙুল সুতো কাটে অবিরাম
ভুলে গেছে ফুল সুতো বুনটের খেলা

কেবলি হেরে যাই

খালেদ রাহী

আমি কেবল হেরে যাই; কেবলি হেরে যাই
সকালে দেখা প্রেমিকের মুখে বিকেলে
শয়তানের মুখোশ।

হেরে যাই; কেবলি হেরে যাই
আহত বাঘিনীর জন্য বাঘের বিষণ্ণ মুখ
অথচ আহত সঙ্গিনীকে খামচে ধরে প্রেমিক পুরুষ।

হেরে যাই; কেবলি হেরে যাই
মানুষ আর বাঘ কে বেশি হিংস্র?

ভাবতে ভাবতে দুঃসময় ভাঙি
আর বাঘকে ভালোবাসি।

মানুষকে না
মানুষকে না
সত্যি বলছি মানুষ কে না ।

শিশুতীর্থ

বিগফুট কি সত্যিই আছে?

নাসরীন মুস্তাফা

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

খুমজুং

নেপালের কাঠমাড়ুতে পাহাড়-পর্বত নিয়ে গবেষণা করার একটি অফিস আছে। নাম ইসিমোড। বুনু বলেছে ইসিমোড-এর বড় নামটা এরকম– ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেইন ডেভেলপমেন্ট। এখানে অনেক বিজ্ঞানী কাজ করছেন, বাঙালিরাও আছেন। বুনুর স্কুলের বন্ধু মুন্নি আপুর আব্বু এরকম একজন বিজ্ঞানী। আম্মুও চেনেন তাঁকে, হাশেম আলীকে। মুন্নি আপুর জন্মদিনে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম আমরা। হাশেম আংকেল খুব মজা করে কথা বলেন। বড়দের চেয়ে ছোটদের সাথে কথা বলতে বেশি পছন্দ করেন বলে মনে হল। যারা ছোটদের পছন্দ করেন, ছোটরাও তাদের পছন্দ করে। আমি দেখলাম, আমিসহ সব ছোটরা হাশেম আংকেলের সাথে কথা বলতে চাইছি। মজার মজার খাবার খেতে খেতে হাশেম আংকেলের কথা শুনতে খুব ভাল লাগছিল।

উনি বহু বছর ধরে পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়ান। পাহাড়ে কি কি অচেনা আগাছা জন্মায়, তা খুঁজে বের করেন। সেই আগাছাগুলো নিয়ে গবেষণা করেন। আগাছা খুঁজতে উনি কত জায়গায় ঘুরেছেন, ইয়েতির বাড়ির কাছে কখনো যাননি? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছিল। তাই প্রশ্নটা করেই ফেললাম।

আংকেল, আপনি কখনো ইয়েতি দেখেছেন?

হাশেম আংকেল কফির কাপ হাতে নিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে বললেন, ইয়েতি আসলে তিনটি প্রাণীর নাম। তুমি কোন্‌টার কথা জানতে চাইছ?

তি–ন–টি? এরকম তো আমি জানতাম না।

আংকেল বললেন, প্রথম প্রাণীটিকে শেরপারা ডাকে ‘জু তেহ্’ বলে। এটা বিশাল লোমশ প্রাণী, প্রায়ই নাকি ভেড়ার পালে হামলা করতে আসে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটা সম্ভবত তিব্বতী নীল ভল্লুক। হ্যাঁ, তিব্বতে নীল রঙের ভল্লুক ছিল, এখন একদমই দেখা যায় না। ইউরোপ-আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এর নীল চামড়া, হাড় আর খুলি নিয়ে গবেষণা করছেন।

আমি জু তেহ্-এর জন্য মন খারাপ করলাম। এরকম কত প্রাণীই তো আছে, যারা হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। সুন্দরবনের সুন্দর বাঘ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারও যদি কোন দিন হারিয়ে যায়? কোন দিন যদি ইয়েতির মত রূপকথা হয়ে যায় আমাদের বাঘ!

আংকেল এরপর ‘থেলমা’র কথা বললেন। এটা সম্ভবত একটি গিবন। বানর গোত্রের পরিচিত একটি প্রাণী। নেপালের খুব উত্তরে সম্ভবত এরা আছে। আমাদের দেখা গিবনের মত নয়, ঠাণ্ডার দেশে থাকে বলে গায়ে লোম বেশি। এর পরের ইয়েতিটা হচ্ছে ‘মিহ্ তাহ্’। এটাই সম্ভবত সত্যিকারের ইয়েতি, যার কথা সবাই বলে বেড়ায়। গরিলা জাতীয় প্রাণী, লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। আর লুকিয়ে না থাকলেও হয়তো খুব বেশি চোখে পড়ত না। কেন-না, এরা থাকে অনেক উঁচুতে। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে কুড়ি হাজার ফুট উপরে।

আমার গলা শুকিয়ে গেল। অত উঁচুতে আমি কি কখনো যেতে পারব? যখন বড় হব, তখনো কি পারব? বুঝতে পারলাম, আমাকে অনেক অনেক খেতে হবে। আম্মুকে আর খাওয়া নিয়ে বিরক্ত করা চলবে না। এর সাথে সাথে অনেক ব্যায়াম করব, খেলাধুলা করব। পেম্বা দর্জি শেরপা আংকেলের মত ফিটনেস পেতেই হবে আমাকে।

আমি কি ভাবছিলাম তা বুঝি হাশেম আংকেল বুঝে ফেললেন। বললেন, অত উঁচুতে উঠে ইয়েতিকে খুঁজে না পেলে কি হবে, বলতো?

খুব খারাপ হবে।

ইয়েতি আছে বলে খুব শক্ত প্রমাণ কিন্তু মেলেনি।

আমি বললাম, ইয়েতি নেই এরকম কোন শক্ত প্রমাণ কি আছে?

হাশেম আংকেল এবার ভাবতে বসলেন। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়েই আছি। উনি অনেক বড় মানুষ। ভেবেচিন্তে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন বলে আশা করছি। অনেকক্ষণ পর হাশেম আংকেল বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। ইয়েতি নেই এরকম কোন প্রমাণ কেউ দেখাতে পারেনি। এমনও হতে পারে, ইয়েতিরা হিমালয়ের যে রকম ঠাণ্ডা, দুর্গম জায়গায় থাকে, সেখানে এখনো মানুষ যাওয়ার সাহসই দেখাতে পারেনি।

হতে পারে।

আমিও একমত হলাম এ ব্যাপারে। তবে মনে মনে নিজেকে বলছি, যখন বড় হব তখন আমি ঠিকই সাহস করে ইয়েতি যেখানে থাকে, সেই ঠাণ্ডা আর দুর্গম পাহাড়ে চলে যাব। ইয়েতির সাথে হয়তো আমারই দেখা হবে। আমার।

হাশেম আংকেল তখন দোলকার শেরপার মত সেই শব্দটি উচ্চারণ করলেন। খুমজুং।

মানে কি এর?

হাশেম আংকেল খুব গভীর ভাবনায় ডুবে গেছেন। আমার প্রশ্ন শুনতে পারলেন বলে মনে হল না।

মানে কি এর?

কেউ আমাকে কিছু বলছে না। আম্মু বলছেন না, দিব্যি বুঝতে পারছি আমার প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যাচ্ছেন। আম্মু যা তা করলেও আমি মাইন্ড করি না। কিন্তু বুনু কেন করবে?

খুব তাড়া যেন সবার ভেতর। লাগেজ গোছাচ্ছে। বেশি ঠাণ্ডা সামলানোর মত কাপড়-চোপড় নিচ্ছে। প্যাকেট খাবারও ভরছে। আমি গেলেই কেমন যেন থেমে যায় আম্মু আর বুনু। কি যেন আড়াল করে, যেন আমি জেনে ফেললেই সমস্যা।

এর মানে কি?

আমি সরাসরি জিগ্যেস করতে বাধ্য হলাম। এবং আশ্চর্য হলাম, কেন-না বুনু কোন কিছুই বলল না। আমার সব প্রশ্নের জবাব দেয় বুনু। এমনকি আম্মু কখনো কখনো কি যেন ভাবতে বসে যান, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন না। বুনু এটা টের পেলে আম্মুকে বকাও দেয়। ছোট বাচ্চাদের কথা মন দিয়ে শুনতে হবে। বুনু নিজেও ছোট বাচ্চা, কিন্তু আমার বেলায় ও যেন আম্মুর চেয়েও বড় অভিভাবক। সত্যি কথা বলি? ও না আম্মুর চেয়েও ভাল অভিভাবক। আমার সব দিকে ওর খুব খেয়াল। কিন্তু এই দুই দিন ধরে দেখছি, ও আমার সাথে যা তা করছে। আমি যে আছি, তা যেন ও খেয়ালই করছে না।

আমি তখন ঠিক করলাম, কথা বলা কমিয়ে দেব। জানালার পাশে বসে তাকিয়ে থাকব দূরের পাহাড়ের দিকে। আমি কথা না বললে ঘর নাকি একদম ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সারাক্ষণ বক বক করি বলে আম্মু মাঝে মাঝে জানতে চান, আমার গাল ব্যথা করে কি না। না, আমার গাল ব্যথা করে না। তবে এখন, ব্যথা না করলেও চুপ হয়ে থাকব। নো বক বক। নো নো নো!

বিশ্বাস কর, প্রায় পুরো একটা দিন আমি জানালার পাশে বসেই থাকলাম। দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছি। আগেও দেখেছি, তবে আজকের মত এতটা সময় ধরে নয়। সকালের সূর্যটা ঐ পাহাড়ের সাদা শরীরে গোলাপী আভা ছড়িয়ে দেয়। বিকেলের আলোতে কমলা হয়ে যায় পাহাড়টা। আমি অনেক দিন নানা রঙে রঙিন পাহাড়টাকে আঁকতেও চেয়েছি। তবে আজকে আঁকতে ইচ্ছে হয়নি। মনে মনে আমি পাহাড়টার সাথে অনেক কথা বলেছি। অ ন্ নে ক!

পাহাড় আমাকে বলেছে, হিমমানবের হুংকার ওর কানে এসেছে। দূরের হিমালয় পাহাড়ের সারি থেকে ভেসে আসে হুংকার। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের সাথে মিশে থাকে। পাহাড়টা দুঃখ করে বলল, ও তো নড়তে পারে না, তাই কোন দিনই হিমমানব যেখানে থাকে, সেখানে যেতে পারবে না। পাহাড়টা আমাকে অনুরোধ করেছে, বড় হয়ে আমি যখন হিমমানবের সাথে দেখা করতে যাব, হিম মানবকে দেখব, তখন যেন ওর শুভেচ্ছা জানাতে ভুলি না। আর হিমমানব আমাকে কি কি বলবে, তা যেন ফিরে এসে ওকে সব বলি।

আমি ডান কানের লতি ছুঁয়ে বলি, বলব। প্রমিজ।

আমরা কোথাও যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি, বলতে পারব না। কেন-না আম্মু আর বুনুকে অনেকবার প্রশ্ন করেও কোন জবাব পাইনি। ওরা খামোখা অন্য কথা বলতে থাকে। ঢাকা থেকে ফুফু ফোন দিয়ে নাকি বলেছেন,

ফুফুদের নিচের তলায় বুক্কা ভাইয়ারা যে থাকেন, সেই বুক্কা ভাইয়াদের বাসায় ডাকাত পড়েছিল। ওরা কেউ বাসায় ছিল না, গ্রামের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। নিচে তিন তিনজন দারোয়ান থাকা সত্ত্বেও কেউ নাকি কিস্যু টের পায়নি। ফুফু বলেছেন, বাসা খালি রেখে কোথাও বেড়াতে যাওয়া ঠিক না। আম্মু আমাদের নিয়ে বাইরে কোথাও যাচ্ছেন শুনে ফুফু চিন্তায় পড়ে গেছেন। আম্মু হাসতে হাসতে বলেছেন, নেপালের বাড়িঘরের জানালায় তো কোন গ্রিলই নেই। ওরা চুরি-ডাকাতির কথা ভাবতেও পারে না। প্রথম প্রথম আমাদের বাড়ির বাড়িওয়ালাকে আম্মু অনুরোধ করেছিলেন, জানালায় গ্রিল দিয়ে দিতে। বাড়িওয়ালা আংকেল স্রেফ না করে দিয়েছেন। জানালায় গ্রিল দিলে নাকি তার বাড়ি আর সুন্দর দেখাবে না।

আম্মু তখন বাড়ি পাল্টানোর কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু অনেকগুলো বাড়ি দেখে বুঝলেন, এখানকার কোন বাড়িতেই জানালার গ্রিল নেই। খোলা জানালায় থাকার অভ্যেস করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

গাড়ির জানালা খোলা। হু হু করে বাতাস ঢুকছে আর আমাদের চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে। আমরা কোথাও যাচ্ছি। কোথাও তো যাচ্ছি, এটা ভেবেই আমার মন ভাল হয়ে গেল। গাড়ি চলতে শুরু করলে আমার খুব ঘুম পায়। আমি আম্মুর বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি। এবারও ঘটনা একই রকম ঘটল। আমি ঘুমিয়ে গেলাম।

ঘুমের ভেতরেই অনেক কিছু দেখা হয়ে গেল আমার। দোলকার শেরপাকে দেখলাম সারা গায়ে-মুখে নানা রঙের আঁকিবুকি করে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছেন। তার সামনে আগুন জ্বলছে। দোলকার শেরপা হাতে ধরা হাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচতে নাচতে আমার সামনে এসে থেমে গেলেন। আমার দিকে ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে বললেন, খুমজুং! খুমজুং!!

পেম্বা দর্জি শেরপা আংকেল সব সময় জিন্সের প্যান্ট আর টিশার্ট পরেন। আজ দেখি তিনি শেরপাদের পোশাক পরে আছেন। পেম্বা আংকেলও নাচছেন। নাচতে নাচতে তিনি আমাকে দুই হাতে তুলে নিলেন। আমাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করতে লাগলেন খুমজুং খুমজুং বলে। আচ্ছা বিপদ তো! আমার খুব বিরক্ত লাগছিল। আমি উহ্ হু বলে বিরক্তি প্রকাশ করি।

ঝাঁকানি তবুও বেড়ে গেল। দোলকার শেরপাও আমাকে ঝাঁকাচ্ছেন। আর সবাই মিলে কেবল বলছেন, খুমজুং! খুমজুং!!

আমি তখন ধমকের সুরে চেঁচিয়ে বললাম, বিরক্ত কর কেন?

এভাবে চেঁচাতে গিয়ে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। ঝিমুনির আবেশ নিয়েই দেখলাম, বুনু আর মুন্নি আপু আমাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলছে, খুমজুং! খুমজুং!!

গাড়ি থেমে গেছে। বাইরে দাঁড়ানো আম্মু আর মুন্নি আপুর আম্মু মানে নিশাত আন্টি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আম্মু ওখান থেকেই বললেন, আমরা চলে এসেছি মা। উঠে পড় এখন।

আম্মুর বুকেই তো ঘুমিয়ে ছিলাম। আমাকে পাশে সরিয়ে রেখে আম্মু কখন গাড়ি থেকে নেমে পড়ল? আমার খুব অভিমান হল। আর ঘুম ভাঙানোর জন্য রাগও হল। কাজেই, উঠে পড় বললেই আমি যে উঠে পড়ব, তেমন ভাব দেখালাম না। তখন কানে এল হাশেম আংকেলের গলার স্বর। অন্য পাশের জানালা দিয়ে আমার দিকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, আমরা খুমজুং এসে গেছি তো! এস বাইরে। দেখ, কী সুন্দর জায়গা!

খুমজুং তাহলে একটা জায়গার নাম? আম্মু, নিশাত আন্টি আর হাশেম আংকেল আলাপ করছিলেন বলে গাড়ি থেকে নামতে নামতে শুনলাম সব।

খুমজুং একটি গ্রাম। নেপালের উত্তর-পূর্ব দিকে সলুখুম্বু জেলার ভেতর পড়েছে গ্রামটি। এর খুব কাছেই সাগারমাথা জাতীয় উদ্যান। এই উদ্যানটিকে নাকি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে।

গ্রামটিকে ঘিরে রাখা পাহাড়টি দেখে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। হিমালয়! ওখানে ইয়েতি থাকে?

হাশেম আংকেল বললেন, গ্রামটাকে ঘিরে রাখা সবচেয়ে কাছের পর্বতটার নাম খুম্বিলা পর্বত। এভারেস্ট, লৎসে আর আমা দাবলাম দেখা যায়, ঐ যে দূরে। ইয়েতি যদি থেকেও থাকে, তা বোধহয় ঐ দূরের পর্বতের অনেক উঁচুতে।

আমি রেগে বললাম, তাহলে সবাই কেন খামোখা খুমজুং খুমজুং বলে আমার মাথাটা খারাপ করে দিচ্ছিল? আর এত পথ পাড়ি দিয়ে এখানেই বা কেন এলাম? এর চেয়ে দিব্যি বিছানায় শুয়ে লিটল রেড রাইডিং হুড পড়লেই তো ভাল হত!

সবাই আমাকে নিয়ে হাসতে শুরু করল। কেবল হাশেম আংকেল ছাড়া। তিনি আমার কাছে এসে হাঁটু ভাঁজ করে বসে আমার চোখের সমান উচ্চতায় নিজের চোখ দু'টো নিয়ে সরাসরি তাকালেন। আমি আগেও লক্ষ্য করেছি, উনি আর সব বড় মানুষদের মত নন। অন্য বড় মানুষদের সাথে কথা বলতে হলে আমাকে ঘাড় উঁচু করে তাকাতে হয়। বড়রা বড় থেকেই আমার মত ছোটদের সাথে কথা বলে। ছোটদের সমান হতে চায় না অন্য বড়রা, কেবল হাশেম আংকেলই আমার সমান উচ্চতায় এসে আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলেন। তখন মনে হয়, উনি আমার সমান কেউ। কথা বলতে ভারি সুবিধে হয়।

হাশেম আংকেলের চোখে আমার জন্য ভালবাসা টের পেলাম। তাই শান্ত হয়ে শুনছিলাম কথাগুলো। তিনি বললেন, আমরা খুমজুং-এ এসেছি, কেন-না এখানে একটি আশ্রম আছে। আর সেই আশ্রমে কি আছে, জান?

না। আমি মাথা নেড়ে বোঝালাম, আমি জানি না।

সেই আশ্রমে রাখা আছে ইয়েতির মাথার খুলি।

আমার বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটানো শুরু হয়ে গেল ঠিক তক্ষুণি।

ইয়েতির মাথার খুলি

খুমজুং গ্রামটা মোটেও অজ পাড়াগাঁ নয়। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ভালই আছে। হোটেলে গরম পানিতে গোসল করে পেট ভরে খেলাম। আপেল পাই পর্যন্ত পাওয়া গেল। গাদা গাদা মাখন গলানো মগে কফি, তাতে আমিও একটু চুমুক দিয়েছি। ঠাণ্ডা কাটবে, আম্মু তা-ই বলেছিলেন।

নিশাত আন্টি মোবাইল চার্জ দিচ্ছিলেন। বললেন, এই রকম জায়গায় বিদ্যুৎ সুবিধা পাব, এ আমি ভাবিনি।

হাশেম আংকেল ল্যাপটপ খুলে বসেছেন। বললেন, সোলার এনার্জিকে কাজে লাগাচ্ছে এরা। লেখাপড়া খুব একটা জানে না। তবে বিদেশি পর্যটকদের সুবিধার জন্য সোলার লাগিয়েছে। আপেল পাই বানাতে শিখেছে।

আম্মু বললেন, গরম পানি কল দিয়ে এল। এর ব্যবস্থা ওরা কিভাবে করেছে, দেখে তো আমি অবাক।

আমি আর বুনু প্রশ্ন করলাম, কিভাবে করেছে?

রান্নার চুলার ভেতর দিয়ে পাইপটা টেনে নিয়ে গেছে গোসলখানায়। চুলার গরমে পাইপের ভেতরকার পানি গরম হয়ে যাচ্ছে। সহজ বুদ্ধি। তবে দারুন।

খুব বেশি মানুষ নেই এখানে। হাশেম আংকেল জানালেন, হাজার দুয়েক মানুষের বাস। সেই ১৯৬১ সালে এখানে একটি স্কুল খুলে দেন স্যার এডমন্ড হিলারির প্রতিষ্ঠিত হিমালয়ান ট্রাস্ট। তখন মাত্র দুইটা ক্লাসরুম থাকলেও এখন নাকি তিনশোর বেশি ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করছে। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাও দেওয়া যায় এখান থেকে।

• পরবর্তী সংখ্যায়

নাসরীন মুস্তাফা
কথাসাহিত্যিক ও বিজ্ঞান লেখক

প্রবাসী ভারতীয় দিবস ২০১৬

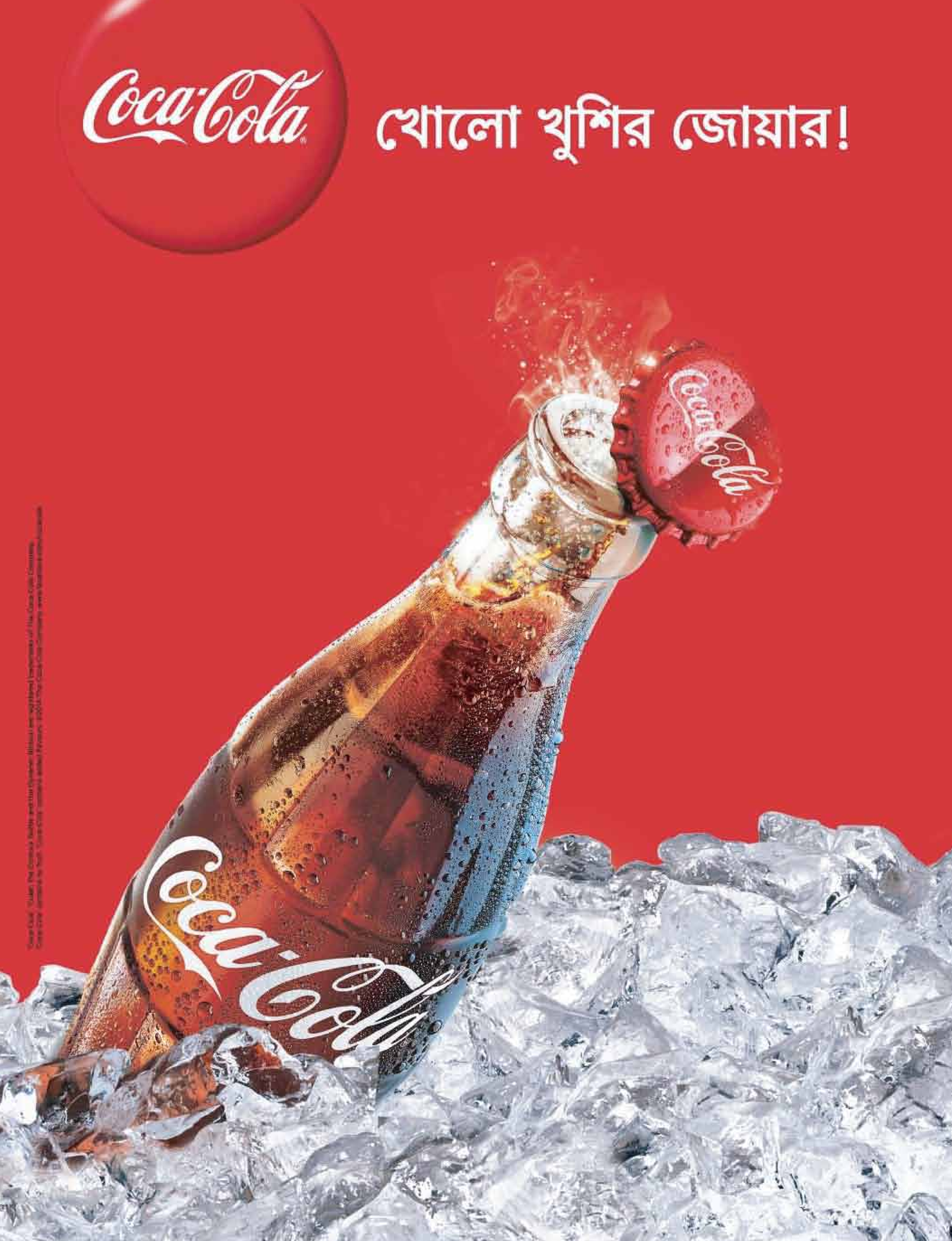
Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!
Coca-Cola
Coca-Cola

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme every year. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 50 reputed Institutions across India. These are short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 years' relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

To apply for any ITEC course, the applicant must visit ITEC portal at https://itecgoi.in and register himself/herself by creating their own login and password. Thereafter, apply for the selected course online. After submitting the application form, the selected course online. After submitting the application form, the applicant should download the form and forward the application to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications. The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-
http://itec.mea.gov.in
The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.
Any queries may be addressed to
fshoc@hcidhaka.gov.in &
commerce@hcidhaka.gov.in

সৌহার্দ

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার প্রত্যেক বছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন-আইটিইসি) কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৫০টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব স্বল্পমেয়াদী কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩-৬ মাসের সংক্ষিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫-৪৫ বছরের মধ্যে হবে এবং সরকারি-বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আইটিইসি-র যে-কোন কোর্সে আবেদন করতে হলে আবেদনকারীকে আইটিইসি-র https://itecgoi.in পোর্টালে গিয়ে নিজস্ব লগইন ও পাসওয়ার্ড তৈরি করে নিজেদের নাম রেজিস্টার করতে হবে। তারপর অনলাইনে মনোনীত কোর্সে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর আবেদনকারী ফরম ডাউনলোড করে আবেদনপত্রটি হাইকমিশন অফ ইন্ডিয়া, ঢাকা-য় ফরওয়ার্ড করবেন।
সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:- http://itec.mea.gov.in লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-এর Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে। যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: fshoc@hcidhaka.gov.in এবং commerce@hcidhaka.gov.in

> মধুসূদন দত্তের সাহিত্যজীবনের সূচনা ইংরেজিতে। তাঁর জীবন, চরিত্র ও মানস-প্রতিভার স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হতে হলে তাঁর ইংরেজি রচনার সঙ্গে পরিচিতি আবশ্যক। মধুসূদন দত্ত কখন থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেন, ঠিক জানা যায় না। তবে তাঁর সতের বছর বয়স হবার পূর্বে যে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন এটা নিশ্চিত।

প্রবন্ধ

সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কবি মধুসূদন

ড. ফেরদৌসী হক

উনিশ শতকে বাঙালি কবিদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ধারাবহির্ভূত এক প্রবল প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষাই তার মূল কারণ। ইংরেজের ঐহিক ঐশ্বর্যের বস্তুপ্রধান দিকটিকে, বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের শক্তিতে দীপ্ত ইংরেজের আবির্ভাবকে সেই যুগে বাঙালি শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছিল– ইংরেজের মননশক্তির আলোকে বাঙালির মনোলোক উদ্ভাসিত হয়েছিল। মধুসূদন দত্ত (১৮২৪–১৮৭৩) হিন্দু কলেজের শিক্ষার গুণে এবং সমকালীন যুগ পরিবেশকে সহজে মেনে নেওয়ায় অতি তরুণ বয়স থেকেই আচার-আচরণে প্রায় সাহেব হয়ে ওঠেন। দেশি ধর্মসংস্কার বা পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি তাঁর তীব্র অনীহা জন্মেছিল। এমনকি ইংরেজ-কন্যা ছাড়া অপর কাউকে বিয়ে করা অর্থহীন, এমন মন্তব্যও তিনি করেছেন। মধুসূদন ইংরেজি পড়তেন, লিখতেন, ভাবতেন ইংরেজিতে। ইংল্যান্ডের তটভূমির জন্য তাঁর তরুণ হৃদয় দীর্ঘশ্বাসে আলোড়িত হত। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শ মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। তিনি সমাজ ও সময়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে অন্বিত এক শিল্পীসত্তা। যথার্থ চর্চা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টিতে, নতুন ধরনের আখ্যানকাব্য রচনায়, দেশের একমাত্র উৎকৃষ্ট মহাকাব্য সৃষ্টিতে, আধুনিক গীতিকবিতা ও সনেট উদ্ভাবনে, কাব্যে চরিত্রসৃজনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গভীরতা প্রকাশ করায় যুগান্তকারী দায়িত্ব পালন করেছেন।

ঐতিহাসিক পারম্পর্য, সমাজ-পারিপার্শ্বিক সমীক্ষা, কালজ জীবন-জিজ্ঞাসা, ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও দৃষ্টিকোণ, 'ঐতিহাসিক সত্যের ব্যঞ্জনাময় সম্প্রসারণ'– এসবেরই একটি সঞ্চারী রূপ-কালজয়ী শিল্পোত্তীর্ণ জীবনঘনিষ্ঠতা তাঁর সাহিত্যে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

কবির জীবনে পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভাব সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ও কবি মোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করেছেন: 'যে সংস্কৃতি একদা য়ুরোপে নবজাগরণ আনিয়াছিল, যাহার ফলে 'humanities' বা মানববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার উপরে স্থান পাইয়াছিল এবং মনুষ্যজীবনগত পরম রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধা বা 'humanism'–ই মানুষকে এক নবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল– আমাদের পক্ষেও তাহা সঞ্জীবনমন্ত্রের মতো কাজ করিয়াছিল, সেই মানবতা বা মর্ত্ত্যপ্রীতির প্রেরণাই আমাদিগকে চঞ্চল করিয়াছিল। এই যুগ-প্রভাব বা যুগ-প্রবৃত্তিই মধুসূদনের জীবন ও তাঁহার কবি-প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াছিল।'

মধুসূদন দত্তের সাহিত্যজীবনের সূচনা ইংরেজিতে। তাঁর জীবন, চরিত্র ও মানস-প্রতিভার স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হতে হলে তাঁর ইংরেজি রচনার সঙ্গে পরিচিতি আবশ্যক। মধুসূদন দত্ত কখন থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেন, ঠিক জানা যায় না। তবে তাঁর সতের বছর বয়স হবার পূর্বে যে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন এটা নিশ্চিত। প্রমাণস্বরূপ ১৮৪১ সালে লেখা সাতটি কবিতার উল্লেখ করা যায়। আর তাঁর লেখা যেসব কবিতায় তারিখ দেওয়া নেই, সেসব কবিতার মধ্যেও অনেকগুলো ১৮৪১ সালে লেখা। ১৮৪২ সালের তারিখ দেওয়া কবিতার সংখ্যাও সাত। এসব কবিতায় ভাষা, ছন্দ এবং আঙ্গিকের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে অনুমান করা যায় যে, এর বেশ কিছুকাল আগে থেকে তিনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর কৈশোরক কবিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কবিতাগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল উচ্ছ্বাস এবং গীতিময়তার প্রাচুর্য। যেমন তিনি লিখেছেন :

I sigh
To cross the vast Atlantic wave
For glory, or nameless grave!

নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁর *মধুস্মৃতি*তে যে কবিতাসমূহের উল্লেখ করেছেন, তার পঞ্চম ও সপ্তম সংখ্যায় বায়রনের *Childe Harold*-এর এবং চতুর্থ ও অষ্টম সংখ্যক কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বায়রন নিসর্গের সৌন্দর্যকে আপন প্রকৃতির মধ্যে আত্মস্থ করতে চেয়েছিলেন। একটি কবিতায় মধুসূদন দত্ত লিখেছেন:

The Silver Rill that gaily warbling flows,
And e'en the dark and everlasting Sea,
All, all these bring oblivion for my woes,
And all these have transcendent charms for me!

এখানে বায়রনের প্রভাব স্পষ্ট। আবার ওয়ার্ডসওয়ার্থকে অনুসরণ করে তিনি লিখেছেন:

Beloved Lake, how oft I think of thee:
How oft I dream of thy calm silver breast,
Where the Moon-beams undisturbed ever rest,
And see themselves reflected beauteously.

পরবর্তীকালে তিনি যে তাঁর লিরিক প্রবণতা ও কল্পনার আতিশয্যের কথা পত্রে লিখেছিলেন, তার পরিচয় এ সময়ের কবিতায় পাওয়া যায়। প্রেমবিষয়ক কবিতার অনুভূতি ও আবেগ পরিলক্ষিত হয়েছে প্রমীলার চরিত্রে, ব্রজাঙ্গনার রাধার বিরহে, আর বীরাঙ্গনা কাব্যের নায়িকাদের চরিত্রে। তিনি লিখেছেন:

And peace and rest for thee is only in the tomb!

এখানে কীটসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবি পরবর্তীকালে যে সৃষ্টি-গৌরবে ভাস্বর হয়ে উঠবেন, তার বীজ নিহিত রয়েছে এ সময়ের কবিতায়। যেমন:

I must pass them for a nobler life,
Where I may find the agonies, the strife of human hearts.

মধুসূদন ভারতের ক্লাসিক সাহিত্য, পুরাণ ও রামায়ণ–মহাভারতের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে বাংলা কাব্যাঙ্গনে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাঁর কবিজীবনের সূচনা যেমন বিদেশি ভাষার মাধ্যমে তেমনি বাংলা কাব্যসৃষ্টির প্রাথমিক প্রেরণা ও পরিকল্পনাও পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য-সম্ভূত। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর নৈপুণ্য বিস্ময়কর। ব্রিটিশ শাসনামলে যে প্রবল অভিঘাতে আন্দোলিত হয়েছিল বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন-ব্যবস্থা, সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত সেই অভূতপূর্ব উদ্দীপনাকে সঞ্চালিত করেছিলেন। তিনিই প্রথম সাহিত্যের বিষয়বস্তু, ভাবাদর্শ ও প্রকাশশৈলীতে ইউরোপার্জিত নবীন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটালেন। মধুসূদন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্যপাঠের রুচি নিয়ে কাব্যসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইংরেজিতে কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ ও পত্রাবলি রচনা করে সাহিত্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। বিশ্বজনীনতাই তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং বিশ্বসংলগ্নতাই তাঁকে নতুন জীবন-জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

মধুসূদনের শিল্পমানস ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে লালিত ও পরিপুষ্ট। তাই তাঁর মধ্যে বাঙালি জীবন এবং ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি– এ দুয়ের সমন্বয় ও সম্মেলন ঘটেছে। ইউরোপের সর্বত্র নতুন মানবমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন গ্রিক-লাতিন-হিব্রু সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের দিকে পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। মধ্যযুগের ধর্মাধিপত্য এবং বিচিত্র কুসংস্কারের মধ্যে প্রাচীন সাহিত্য ও জ্ঞানের সম্পদ আচ্ছন্ন হয়েছিল, বিকৃত হয়েছিল, রেনেসাঁ তাকে উদ্ধার করে। এদেশের রেনেসাঁর প্রাচীনের পুনরুত্থান ঘটল দুটি ভিন্ন পথে। প্রথমত, ইউরোপীয় প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে বাঙালি আকণ্ঠ গ্রহণে উন্মুখ হয়ে উঠল। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যরাজ্যে আবিষ্কারের পদক্ষেপ পড়ল। ইউরোপীয় ক্লাসিক্সের আলোচনা যেমন চলতে লাগল, ভারতীয় ক্লাসিক্স রামায়ণ–মহাভারত, কালিদাস প্রমুখের সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চা শুরু হল। ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় ক্লাসিকসের ঐতিহ্য অনুসরণে মধুসূদনের সাধনা ও সাফল্য সর্বজনবিদিত। বিদেশি ক্লাসিক্সে মধুসূদনের আকর্ষণ ছিল অতি তীব্র। হোমার-ভার্জিল-টাসো-দান্তে-ওভিদের মত কবিদের অনেককেই তিনি মূল ভাষায় অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর কাব্যের তিন–চতুর্থাংশ গ্রিক বলে ঘোষণা করেছেন, একজন গ্রিক যেভাবে লিখত সেভাবে তিনিও লিখলেন– একথা বলেছেন *মেঘনাদবধ কাব্য* প্রসঙ্গে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-কালীপ্রসন্ন-ভূদেব-বঙ্কিমচন্দ্রের মত মনীষী প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যাদি উদ্ধারের যে চেষ্টা করেছেন তা রেনেসাঁর বিশিষ্ট আদর্শে দীক্ষিত হবারই ফল। ক্লাসিক ধারার কবিরা, যেমন মধুসূদন-হেমচন্দ্র সকলেই প্রাচীন ভারতীয় প্রসঙ্গ থেকে কাব্যোপকরণ সংকলন করেছেন একাগ্রচিত্তে। মধুসূদনের *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* ও *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* (এ কাব্যেরও কিছু কবিতা রামায়ণ–মহাভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত) ব্যতীত অপর তিনটি কাব্যের পশ্চাতেই রামায়ণ–মহাভারতের কাহিনির উৎস। ভারতীয় নারী চরিত্রের মধ্যে দু'জনের প্রতি মধুসূদন সহানুভূতিশীল ছিলেন। একজন রামায়ণের সীতা, অন্যজন বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা। রাধার প্রতি তাঁর আকর্ষণের কারণ মানবিকতাবোধ। ব্রজের রাধা তাঁর কাব্যে কোন তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশিত নন, মানবীরূপে চিত্রিত। কৃষ্ণবিরহিণী রাধা তাঁর দৃষ্টিতে Mrs. Radha, 'Poor Lady of Braja'। তাঁর বিরহ-বেদনাও তাই মর্তমানবীর বেদনা। *মেঘনাদবধ* এবং *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* রচনার সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদন দত্ত *কৃষ্ণকুমারী নাটক*ও রচনা করেছিলেন। একই সময়ে তিনটি ভিন্ন সুরের রচনায় তিনি যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। এ প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ বসুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 'একদিকে *ব্রজাঙ্গনা*র এই সুমধুর বংশীধ্বনি এবং অপরদিকে *মেঘনাদবধে*র গম্ভীর ভেরী নিনাদ শ্রবণ করিলে মোহিত ও বিস্মিত হইতে হয়। ইহার সঙ্গে কুমারী কৃষ্ণার মর্ম্মভেদী বিষাদোচ্ছ্বাসও কবির লেখনীদ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছিল।' তিনি *মেঘনাদবধ কাব্যে* সীতাকে রূপায়িত করেছেন বন্দিনী নারীর বিমূর্ত প্রতীক হিসেবে। *Captive Ladie* কাব্যে সমুদ্রপারে বন্দিনী রাজ-দুহিতাকে রাজা জয়চন্দ্রের কারাগার থেকে যেভাবে নায়ক পৃথ্বীরাজ উদ্ধার করে এনেছিলেন, তেমনিভাবে লঙ্কাপুরীতে বন্দিনী সীতাকে উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্রের সেনাকে অলঙ্ঘ্য সমুদ্র পাড়ি দিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করতে হয়েছিল। যেমন:

And how the wanderer of the wood
Came home–but came to solitude–
And in his grief sought her in vain
O'er mount–in cave–by found–on plain

উনিশ শতকে এদেশে যে নবজাগরণ সাধিত হয়, তা বাঙালি মনের সঙ্গে ইংরেজি তথা ইউরোপীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির পরিচয় ও যোগসূত্রের

ফলমাত্র। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার পুনর্জাগরণের মূলে রয়েছে হেলেনিক সভ্যতার নবাবিষ্কৃতি। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে প্রথম যৌবনে মধুসূদন ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন। কিন্তু বিশপ্‌স কলেজে অধ্যয়নের সময় থেকেই তিনি যে ক্লাসিক্‌সের সঙ্গে পরিচিত হলেন, তা তাঁকে আধুনিক কালের ইউরোপ থেকে পুরাকালের গ্রিসে ধাবিত করে। এজন্যই তিনি ধীরে ধীরে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যচর্চা অপেক্ষা ক্লাসিকস বিশেষত গ্রিক সাহিত্য অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি গ্রিক সাহিত্যের অনুশীলন করেছেন। মাদ্রাজ প্রবাসকালে দুঃখ, দারিদ্র্য ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েও তিনি ক্লাসিকস সাহিত্য অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৬০ সালের ২ সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ বসুর কাছে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর ক্লাসিকস প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়: Really what rapid advances our languages (I feel tempted to use the words of Alfieri and say Nostra Divina Lingua) is making towards perfection and how it is shaking off its sleep of ages.

গ্রিক সাহিত্য ও ট্রাজেডি মধুসূদনকে মানবজীবনের মহিমা সম্পর্কে সচেতন এবং জীবনের রহস্যসন্ধানে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। *কৃষ্ণকুমারী* নাটক (১৮৬১) রচনার পূর্বে মধুসূদন দত্ত মহাভারতের *সুভদ্রা উপাখ্যান* অবলম্বনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে *সুভদ্রা* নাটকের এবং দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশের কন্যা সুলতানা রিজিয়ার চরিত্রাবলম্বনে *রিজিয়া* নাটকের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই নাটক দুটি সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহদানের পরিবর্তে রাজপুত-ইতিহাসকে রচনার উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের জন্য মধুসূদনকে লিখেছিলেন: Can't we call out a subject from the history of the Rajputs? I believe, that field is pretty extensive and may yield innumerable hints for the imagination of a writer like yourself. তাই বিশ্বজনীন পটভূমিকায় মানবজীবন ও মানবভাগ্যকে নিরীক্ষণ করতে তিনি কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। *কৃষ্ণকুমারী* নাটকের প্রেক্ষাপট নির্মাণের মূল এখানেই। টডের *Annals and Antiquities of Rajasthan* অবলম্বনে *কৃষ্ণকুমারী* নাটক রচিত। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সার্থক ট্রাজেডি হিসেবে এ নাটকের গুরুত্ব অপরিসীম। নাটকটি পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসারে রচিত। এ নাটকে নাট্যকার ঘটনাবস্তু অপেক্ষা চরিত্রচিত্রণের প্রতি সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। রোমান কবি ওভিদের (Publius Ovidius Naso) *Heroides* বা Heroic Epistles-এর আদর্শে মধুসূদন দত্ত *বীরাঙ্গনা কাব্য* রচনা করেন। একুশটি পত্র রচনার পরিকল্পনা তাঁর ছিল। কিন্তু এগারটি পত্রে *বীরাঙ্গনা কাব্য* সমাপ্ত হয়। এ কাব্যের নারী চরিত্রগুলো ভারতীয় পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে গৃহীত হয়েছে। ভাবগত ও বিষয়গত দিক থেকে কয়েকটি পত্র সম্পূর্ণ পুরাণানুসারী। এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় প্রাচ্য পুরাণ অপেক্ষা পাশ্চাত্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে। যেমন 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'র উক্তি: 'ক্ষত্র-কুলবালা আমি; ক্ষত্র-কুল বধূ; / কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি?' এ নারী ভাবনার প্রাধান্য এবং নরনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে মধুসূদন দত্তের ভাবনার আধুনিকত্ব আমাদের চিনে নিতে সাহায্য করে হিন্দু কলেজের ছাত্র, রিচার্ডসনের প্রিয়শিষ্য মধুসূদন দত্তকে। যিনি জীবনে এবং জীবন-সম্পর্কিত ধারণায় ভাবতে ভালবাসতেন 'enlightened partner' বা আলোকপ্রাপ্ত সঙ্গিনীর কথা, বাল্যবিবাহের প্রতিরোধ ছিল যাঁর ধর্মান্তরীকরণের অন্যতম কারণ। মধুসূদন পূর্ণ বয়সে মিল্টনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় বায়রনই তাঁর আদর্শ ছিলেন। বায়রন, স্কট এবং ম্যুর– এই তিনজনের আদর্শে তাঁর সাহিত্যিক জীবন পরিবর্ধিত হচ্ছিল। ডিরোজিওর প্রথম কাব্যগ্রন্থ আঠারো বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। হিন্দু কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে মধুসূদনও ইংরেজি কবিতার লেখক হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেন। উভয়েই বায়রনের শিষ্য এবং সাহিত্যপিপাসু– জ্ঞানান্বেষী। সুতরাং ডিরোজিওকে না দেখেও মধুসূদন তাঁর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করে বাংলা গদ্য প্রসার লাভ করে এবং এই গদ্যকে অবলম্বন করে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি রচিত হয়। সৃষ্টি হয় বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র সম্ভার।

উনিশ শতকে নবজাগরণের ধারক ও বাহক দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০–'৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–'৯৪) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১)। নবজাগরণের বাণী মানবতা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাঁদের প্রতিভার ইন্ধন যুগিয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যে যেমন মিল্টন একক গৌরবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, বাংলা সাহিত্যেও তেমনি মধুসূদন দত্ত। তিনি *শর্মিষ্ঠা* নাটকে প্রাচ্য রচনাশৈলীর সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটান। মধুসূদন প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্যকে নবজাগরণের যুগচেতনা এবং মানবতাবাদের সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। *মেঘনাদবধ কাব্য* তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ কাব্য সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, 'বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণরসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্বাচন শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে, তাঁহার *মেঘনাদবধ* বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।'

Captive Ladie কাব্য পাঠ করলে মধুসূদন দত্তের রচনাপ্রণালির আদর্শ বুঝতে পারা যায়। যে অলঙ্কারবিন্যাসপ্রিয়তা মধুসূদন দত্তের রচনার একটি বিশেষ লক্ষণ *Captive Ladie কাব্যের* সর্বত্রই তার আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়েছে। *Captive Ladie কাব্যে* প্রযুক্ত অনেক অলঙ্কার ও ভাব পরে তিনি তাঁর অন্যান্য কাব্যে পরিবর্তিত আকারে ব্যবহার করেছেন। লঙ্কা-প্রসঙ্গে এমন দু'একটি ভাষাচিত্র কবি ইংরেজি *Captive Ladie* কাব্যটিতে এঁকেছেন যার সঙ্গে *মেঘনাদবধ কাব্যে* অঙ্কিত চিত্রের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন সমুদ্রবন্ধন প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন:

The very ocean wore his chain

মেঘনাদবধ কাব্যে আছে এর হুবহু প্রতিধ্বনি:

আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে!

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে মধুসূদন দত্ত নানাপত্রে সাহিত্যের রূপ ও রীতি, ভাষা ও ছন্দ, অনুপ্রেরণা ও শিল্পসিদ্ধি, এসব প্রসঙ্গ ও প্রকরণ নিয়ে ক্রমাগত লিখতে থাকেন। *শর্মিষ্ঠা* খ্যাতিলাভ করলে নানা পত্রে তিনি লেখেন *পদ্মাবতী নাটক*, এরপর *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য*। *পদ্মাবতী* রচনাকালে অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কার করেন এবং *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে* এর প্রয়োগ করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে তিনি রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে অনেক পত্রালাপ করেছেন। রাজনারায়ণের সঙ্গে শুধু ছন্দ নয়, সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ নিয়েও পত্রালাপ করেছেন। রাজনারায়ণকে তিনি সমালোচনায় হাত দিতে বলেছেন। অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে লঙ্গিনাস, কুইনটিলিয়ন, বার্ক, কামেস, অ্যালিসন, অ্যাডিসন, ড্রাইডেন, এমনকি শ্লেগালের সঙ্গেও তিনি পরিচিত। একটি চিঠিতে *মেঘনাদবধ কাব্য* সূত্রে রাজনারায়ণকে লিখেছেন গ্রিক পুরাণের অনুপম সৌন্দর্য তিনি এ কাব্যে বিস্তার করতে প্রয়াসী। সোজাসুজি গ্রিক পুরাণের কাহিনি অনুবর্তন করে নয়, গ্রিকদের অনুপম সৌন্দর্য ও কল্পনাভঙ্গি দ্বারা ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনি রূপান্তরিত করে। তাই *মেঘনাদবধ কাব্য* হোমারের *ইলিয়াডে*র আদলে রচিত। মহরমের মিছিল দেখে তিনি কারবালার কাহিনির মধ্যে মহাকাব্যের উপাদান আবিষ্কার করেছেন। ১৮৬১ সালের ১৪ জুন রাজনারায়ণের নিকট একথা বলতে গিয়ে তিনি আক্ষেপ করেছেন : 'We have no such subject'। এই সময়ে রাজনারায়ণের নিকট লেখা পত্রগুলোতে *মেঘনাদবধ কাব্য*, *কৃষ্ণকুমারী নাটক*, *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* ও *বীরাঙ্গনা কাব্যের* প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। সৃষ্টির উন্মাদনায় তিনি মেতে উঠেছেন।

ইউরোপীয় রেনেসাঁলব্ধ জীবনচেতনা, তার গতিচাঞ্চল্য ও শিল্পজিজ্ঞাসার অঙ্গীকারে মাইকেল মধুসূদন দত্তের শিল্পীচৈতন্য উনিশ শতকীয় বাঙালি মনীষার এক বিস্ময়কর অনুষঙ্গ। জাতীয় অস্তিত্বের সমগ্রতার সঙ্গে তিনি একীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধ্রুপদী ঐতিহ্যপ্রবাহের প্রাণস্পন্দন। তার ফলে, তাঁর স্রষ্টামানস বাঙালির জাতীয় জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি ও শিল্পজিজ্ঞাসা এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চেতনাপ্রবাহের সমন্বয়ে নির্মাণ করতে পেরেছিল এক স্বতন্ত্র ও গৌরবোজ্জ্বল শিল্পলোক। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ইয়ং বেঙ্গলরা যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা মানবতাবাদেরই আদর্শ। শেক্সপিয়র মিল্টন থেকে আরম্ভ করে স্কট, বায়রন পর্যন্ত সব সাহিত্যিকদের দানে ইয়ং বেঙ্গলদের মনন পরিপুষ্ট হয়েছিল। শেক্সপিয়রের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মানবচরিত্রের অপূর্ব বিশ্লেষণ, মিল্টনের নৈতিকতা ও মানবপ্রেম এবং বায়রনের অভূতপূর্ব আত্মম্ভরিতা সব এসে মিলেছিল বাঙালির মননে।

আবার সেই সঙ্গে ড্রাইডেন, অ্যাডিসন ও পোপও বাদ যাননি। অর্থাৎ ইয়ং বেঙ্গলদের মুখপাত্র হলেন মধুসূদন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-'৯৪) আর ইয়ং বেঙ্গলদের হিউম হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-'৮৬)। আর যাঁরা এসমস্ত জ্ঞান ছাত্রদের বিতরণ করছিলেন তাঁদের পুরোধা হলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-'৩১)। নবচেতনাদৃপ্ত বাংলার প্রথম প্রবক্তারা ডিরোজিওর কাছে পাঠ নেবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ডিরোজিও ছিলেন ইয়ং বেঙ্গলদের গুরু। তাঁর মধ্যে ছাত্ররা প্রথম লক্ষ্য করল বাক্য এবং কর্মে পরিপূর্ণ ঐক্য। 'এই একটি মানুষ যে যাহা বলে তাহাই করে। অথচ বয়সে সে তখনও তারুণ্যের কোঠা পার হয় নাই।'

ডিরোজিও ছিলেন Age of Reason-এর প্রতীক। পুরনো আচার ও কুসংস্কারের মোহজাল ছিন্ন করতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর এবং তাঁর সেই দীপ্ত তেজ ও অকুতোভয়তা, সেই বিচারশীলতার উত্তরাধিকার তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর শিষ্যদের। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-'৮৫), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-'৬৮), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-'৯৮), রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-'৮৩) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ডিরোজিও এদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং দূরাতীত স্বর্ণময় যুগের বহু বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন। এদেশ তাঁর জন্মভূমি, স্বদেশভূমি ও মাতৃভূমি। ইউরেশিয়ান বা ফিরিঙ্গি মানসিকতা তিনি কখনো দেখাননি। এদেশকে নিয়েই ছিল তাঁর গর্ব ও গৌরব। এদেশের মাটি আর মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর একাত্মতা। দেশ ও দেশের স্বাধীনতাকে তিনি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন।

ডিরোজিওর আগে বাঙালিকে রেনেসাঁর আলোকোজ্জ্বল পথে ধাবিত করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার। কিন্তু এঁদের পরে যিনি সকল বাধা শুধু যুক্তি দিয়ে নয় পদাধিকার বলে নস্যাৎ করে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে ভারতবাসীকে উদ্ভাসিত করলেন তিনি লর্ড মেকলে। শিক্ষার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার আরও কতকগুলো সমাজসংস্কারমূলক কাজ করেন যা ইয়ং বেঙ্গলদের মনে নবপ্রেরণার সৃষ্টি করে। এই সমাজ-সংস্কারের ফলে পাশ্চাত্য ভাবধারা ইয়ং বেঙ্গলদের মনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের যুগকে Thomson ও Garratt 'Era of Reforms and Suppression of Inhumanities'-এর যুগ বলে ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মাঝে স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটান, জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। ফলে স্বদেশপ্রেম, স্বাতন্ত্র্যবোধ, সততা, নিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ডিরোজিওর ছাত্ররা নবদিগন্তের সূচনা করেছিল। অধ্যয়ন ও অনুশীলনের আবিশ্ব বিস্তারের মধ্যেই যে জাতীয় সংস্কৃতির উজ্জীবন-সম্ভাবনার বীজমন্ত্র নিহিত, মধুসূদনের বৈচিত্র্যসন্ধানী শিল্প-অন্বেষা সে সত্যেরই যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করেছে। সেজন্য তাঁর চিরায়ত মানবিক শিল্প-ঐতিহ্যের নির্যাস-আহরিত স্রষ্টাচৈতন্য প্রতিনিয়ত জীবন ও শিল্পের সামগ্রিক আয়তনের মধ্যে তরঙ্গায়িত ও স্পন্দিত হয়ে উঠেছে।

রেনেসাঁর সময়ে ইতালির জনগণ তাদের নিজেদের শহর নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। দার্শনিক মেকিয়াভেলি, কবি পেত্রার্ক স্বদেশভূমি ইতালির কল্যাণ কামনা করেছেন। ষোড়শ শতকে সেলিনি ফ্লোরেনটাইনদের শুধু স্বজাতি বলে ভাবতেন। রেনেসাঁর কালে ইতালি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন সর্বত্র জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছে। ভারতবর্ষে মধুসূদনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে স্বদেশপ্রেমের অমেয় বাণী।

রেনেসাঁর কাব্যগুলো গড়ে উঠেছে জাতীয় জীবন থেকে। মধুসূদন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রচনা করেন *মেঘনাদবধ কাব্য*, *চতুর্দশপদী কবিতাবলি*। *মেঘনাদবধ কাব্য* রচনার সময়ে তিনি বাল্মীকি, হোমার, মিল্টন, ট্যাসো, দান্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। *ব্রজাঙ্গনা কাব্যে* বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব, *বীরাঙ্গনা কাব্যে* ওভিদের আদর্শানুসরণ করেছেন কবি। *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* রচনাকালে তিনি ইতালীয় কবি পেত্রার্ক এবং শেক্সপিয়রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন।

উনিশ শতকে 'পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রভাব বাঙালি মনকে প্রভাবিত করেছিল। তার অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের দ্বন্দ্ব তাকে আধুনিকতার শীর্ষে পৌঁছে দিল। বাঙালি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করল। বাঙালির রেনেসাঁর নব উদ্বোধক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাই তাঁর কাব্য স্বতন্ত্র।' তিনি ব্যক্তি ও বিশ্বের দ্বন্দ্বের সমাধান খুঁজেছেন। তাঁর সাহিত্যে রোমান্টিকতার উন্মেষ ঘটেছে। গীতিকবিতায় নর-নারীর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন দ্রুত ছড়িয়েছে। তিনি রোমান্টিক কবিদের মধ্যে বায়রনের ভক্ত ছিলেন। তাঁর কাব্যে মানবমহিমা ধ্বনিত হয়েছে। মধুসূদন দত্ত পরাধীন ভারতের যন্ত্রণাকে দেখেছেন। পরাধীন দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার রূপ *মেঘনাদবধ কাব্য*। তিনি জাতীয় কবিতার, নাট্যশালার স্বপ্ন দেখতেন। তাই তাঁর সাধনা পরবর্তী প্রজন্মের আদর্শ হয়েছিল। চিরন্তন মানবমহিমা আর ঐতিহ্যবোধ আবিষ্কারের পথিকৃৎ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর অধিকাংশ ইংরেজি কবিতা ১৮৪১ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে লেখা। প্রথম তারুণ্যের সজীবতা ও চাঞ্চল্য এদের মধ্যে উচ্ছ্বাসিত। তিনি সনেট এবং লিরিক দু'ধরনের কবিতা লিখেছেন। প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলো সনেটের রূপবদ্ধ। কিন্তু প্রেমবিষয়ক কবিতা লিরিকজাতীয়।

মধুসূদন দত্তের ইংরেজি রচনাবলির অধিকাংশই মাদ্রাজ প্রবাসকালে রচিত। মাদ্রাজে অবস্থানকালে তিনি *Captive Ladie* কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যটি তাঁকে মাদ্রাজের সমাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ১৮৪৯ সালে *Captive Ladie* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ কাব্যের পটভূমি ভারত ভূখণ্ড। অন্যদিকে *Visions of the Past* কাব্যের কেন্দ্রীয় বিষয় খ্রিষ্টীয় ধর্মীয় বিশ্বাস। কাব্যদুটির প্রকৃতি ভিন্ন। কিন্তু কাব্যদ্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে কবির স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার অমেয় বাণী। মধুসূদন দত্ত মাদ্রাজে অবস্থানকালে *The Upsori* কাব্যটি রচনা করেন। এই কাব্যটি পুরাণাশ্রিত। এখানে শুধু স্বর্গের অপ্সরী নয়, প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর বর্ণনাও আমরা দেখতে পাই। *Rizia Empress of Inde* নাটকটিও মাদ্রাজ প্রবাসে রচিত। এখানে কবির প্রিয় স্বদেশ এবং তার বুকের উপর দিয়ে কুলকুল ধ্বনিতে বয়ে চলা কপোতাক্ষ নদের পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৫৬ সালে যখন মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন, তখন বাংলায় অনুবাদ নাটকের আধিপত্য। জি সি গুপ্তের *কীর্তিবিলাস* এবং তারাচরণ শিকদারের *ভদ্রার্জুন* নাটক দুটির মাধ্যমে ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে মৌলিক নাটক রচনার সূত্রপাত হয়। কিন্তু এগুলো মঞ্চে অভিনীত হয়নি। বাংলার প্রথম অভিনীত মঞ্চসফল নাটক রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত *রত্নাবলী* (১৮৫৮)। এই নাটকটির ইংরেজি অনুবাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তকে এবং তাঁর ইংরেজি *Ratnavali* নাটকটি সর্বত্র উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল। *Ratnavali নাটক* প্রকাশিত হলে মধুসূদনের প্রতিভা ও অনুবাদের দক্ষতা সম্পর্কে কলকাতার বিজ্ঞসমাজ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এত উচ্চাঙ্গের ইংরেজি এর আগে কোন নাটকের অনুবাদে প্রকাশিত হয়নি।

রামনারায়ণ তর্করত্নের *রত্নাবলী* নাটক অনুবাদের সূত্র ধরে পাইকপাড়ার রাজাদের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। সার্থক বাংলা নাটকের ভিত্তিস্থাপনের সঙ্গে শুরু হয় আধুনিক কাব্যসাহিত্যের পথচলা। তিনি সাহিত্যে Blank Verse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের মাধ্যমে ভাষার শৃঙ্খলমুক্তি ঘটিয়ে তিনি সাহিত্যে নবপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একজন সৃজনশীল গদ্যশিল্পী। তাঁর গদ্যরীতিতে আছে শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ, উপমা-রূপকের যথার্থতা, বাক্যের সুগঠিত অন্বয়, ছন্দের ঝংকার এবং সর্বোপরি সুরধ্বনি। তাঁর রচনাশৈলী অসাধারণ। তাঁর ভাষায় আছে ওজস্বিতা ও সাবলীল গতি। তিনি গদ্যের যাদুকর। শিল্প সাহিত্যে ছন্দ-অলঙ্কারের প্রয়োগ অনবদ্য আনন্দ ও প্রশান্তির সঞ্চার করে। মধুসূদনের সাহিত্যের উপমা অলংকার বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে দৃষ্টান্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। মধুসূদনের শিল্পীসত্তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভাবসঞ্চার করেছে। কবির দৃষ্টিতে সৌন্দর্যের ঐহিক ও পারত্রিক রূপ, বস্তুময় ও ভাবময় রূপের সমাবেশ ও সমন্বয় সাধিত হয়েছে।'

পাশ্চাত্যের কাব্যনাটক অনুশীলনের ফলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের গঠনপ্রণালি ও প্রকৃতির সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। *শর্মিষ্ঠা* নাটক লেখার বহু আগে থেকেই তিনি গ্রিক ও ইংরেজি নাটকের সঙ্গে বিশেষত শেক্সপিয়রের নাটকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর জীবনী-লেখক বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন: 'নাট্যরচনার সর্বপ্রথম প্রয়াসরূপে মধুসূদন মহাভারতের একটি ঘটনা অবলম্বন করে *শর্মিষ্ঠা* নাটক রচনা করিলেন। কিন্তু মধুসূদন ইংরেজি নাটকের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইলেও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁহার এই নাটকের মধ্যে বৈদেশিক আদর্শকে ব্যবহার করিলেন।' এই নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। উন্নত ও শালীন রুচিবোধ

আর প্রয়োগ–নৈপুণ্য সম্ভবত এ নাটকের এত খ্যাতির কারণ।

পাইকপাড়ার রাজাদের অনুরোধে মধুসূদন দত্ত *শর্মিষ্ঠা* নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। *শর্মিষ্ঠা* নাটক প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর থেকে মধুসূদন দত্তকে লিখেছিলেন: 'Sermista is exactly after the pure classical model, is in many places full of sterling poetry, and displays considerable knowledge of human nature!' সমকালীন সাহিত্যে যা কিছু নতুন, অভিনব– সবকিছুর সৃষ্টি সাফল্যের অনন্য অধিকারী মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সৃষ্টির মতই আশ্চর্য এক বর্ণময় জীবন তাঁর। প্রতিভা ও অনুভূতিপ্রাবল্যের, আকাঙ্ক্ষা ও আকিঞ্চনের, বৈপরীত্য ও নাটকীয়তার অন্তহীন দ্বন্দ্বে দীর্ণ, বিধ্বস্ত ও বিপন্ন তাঁর জীবন। মধুসূদন দত্তের অন্তর্লোক ও বহির্লোক আশ্চর্যভাবে মিশে যায় পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে।

তাঁর চিঠিগুলোর বেশির ভাগ ইংরেজিতে লেখা। পত্রসাহিত্য হিসেবে মধুসূদন দত্তের চিঠিগুলোর মূল্য অপরিসীম। ইংরেজিতে লেখা চিঠিগুলোতে তাঁর হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একদিকে চিঠির ব্যক্তিগত সহজ সুরটি কোথাও ব্যাহত হয়নি, অন্যদিকে সংবাদ আদানপ্রদানের শুষ্ক সামান্যতায় তা পরিসমাপ্ত নয়। মধুসূদন দত্তের পত্রাবলিতে ধ্বনিত হয়েছে উনিশ শতকের নবজাগৃতির প্রধান পুরুষের হৃদয়ের ছাপ। তাঁর পত্রাবলিতে বিধৃত হয়েছে তৎকালীন যুগপরিচয়, তাঁর সাহিত্যকর্ম, কবিমানস এবং ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্যাবলি। মধুসূদন দত্তের পত্রাবলিতে উনিশ শতকের নবজাগৃতির বাণী ধ্বনিত হয়েছে। এসব পত্রে দেখা যায়, সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। একটি চিঠিতে *মেঘনাদবধ কাব্য*

> প্রতিভাবান ব্যক্তিরা যেমন তাঁদের সৃষ্টিমাহাত্ম্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন, তেমনি তাঁদের জীবনের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে সমালোচিত হন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের অলৌকিক কবিপ্রতিভা ও অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও চপলতা জড়িত ছিল।

সূত্রে রাজনারায়ণকে লিখেছেন গ্রিক পুরাণের অনুপম সৌন্দর্য তিনি এ কাব্যে বিস্তার করতে প্রয়াসী। সোজাসুজি গ্রিক পুরাণের কাহিনি অনুবর্তন করে নয়, গ্রিকদের অনুপম সৌন্দর্য ও কল্পনাভঙ্গি দ্বারা ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনি রূপান্তরিত করে। তাই *মেঘনাদবধ কাব্য* হোমারের *ইলিয়াডে*র আদলে রচিত।

জীবনাদর্শ, বিষয়, প্রকরণ, ছন্দ, শব্দ সর্বোপরি সামগ্রিক কাব্যকলার উত্তরণে মধুসূদন দত্তের স্রষ্টামানস যুগপৎ আবিষ্কারক ও বিবেচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তিনি সাহিত্যকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালে ১৮৪৯ সালের ১৯ মার্চ একটি চিঠিতে তিনি গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন : 'All that I want to make me a regular man of letters, is a decent situation with a few hundred a month. Who will give it me? Is there none in India?'। ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর আর্থিক সংকট তো কমেনি বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৬৫ সালের ২৬ জানুয়ারি তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই থেকে গৌরদাসকে চিঠিতে যা লিখেছিলেন তা যেন মাদ্রাজ থেকে ১৮৪৯ সালে লেখা চিঠির প্রতিধ্বনি: 'I wish I could devote myself to its cultivation, but, as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living.' আর্থিক সংকট তাঁর কবিসত্তাকে মাঝপথে থামিয়ে দেবার অন্যতম কারণ। অর্থসর্বস্ব সমাজের নির্দয় চেহারা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জ্ঞাতিরা পৈতৃক সম্পত্তি আত্মসাৎ করার বহু চেষ্টা চালিয়েছিল। তিনি অনেক কষ্টে জ্ঞাতিদের বিরুদ্ধে মামলায় জিতে ১৮৬০ সালে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করেন। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা। তাঁর ভাষায়: `But I sigh for some independent position, so that I might devote myself, wholly and solely, to my favourite studies.'–এই যে independent হবার আকাঙ্ক্ষা, এটাই স্থবির সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিপরীত চেতনা, নতুন যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চিন্তা, গণতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ মানুষের নিজস্ব স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গির চিন্তা। তিনি তাঁর সমকালের চেয়ে প্রাগ্রসর ছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পশ্চাৎপদ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে তিনি অগ্রসর গণতান্ত্রিক চেতনায় ভাস্বর ছিলেন। তাঁর মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজচেতনা, দেশভাবনা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা তাঁর যুগ, সমাজ, শ্রেণি থেকে অনেক অগ্রসর, আধুনিক ও প্রগতিশীল ছিল। তিনি যুক্তিবাদের পথে হেঁটেছেন। যখন সমাজে নারীরা পুরুষের ভোগ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত হত, সেই সমাজে তিনি তাঁর *বীরাঙ্গনা কাব্যে* নারী-স্বাধীনতার জয়গান গেয়েছেন। নাটক ও কাব্যে নারীর দার্ঢ্য ও শক্তিকে তুলে ধরেছেন। যে সমাজে পরিবার আনুগত্যই প্রধান কথা, যেখানে যূথবদ্ধতার মধ্যে ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব হয়না, সেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজে তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলেছেন। নিজের জীবনের পথ নিজেই বেছে নিয়েছেন। তিনি সাহিত্যে নবযুগের উন্মেষ ঘটান। পাশ্চাত্য সাহিত্যের আলোকে পশ্চাৎপদ ভাষাকে পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে ট্রাজেডি, প্রহসন, সনেট, মহাকাব্য লিখলেন। ভাষা ও সাহিত্য হৃদয়ঙ্গম করার মতো মানসিকতা তৎকালীন বাংলার সাহিত্যপ্রেমীদের ছিল না। কালীপ্রসন্ন সিংহ বা রাজনারায়ণ বসুর মত সাহিত্যবোদ্ধা সে যুগে অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রম। হিন্দু পুরাণের প্রতি মধুসূদন দত্তের অদম্য আকর্ষণের কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন। হিন্দু পুরাণে নিজের দখল নিয়ে তিনি গর্ব অনুভব করতেন। পাশাপাশি মুসলমানদের ঐতিহ্য ও কাহিনি তাঁকে আকৃষ্ট করতো, মহরম নিয়ে একটি মহাকাব্য লেখার ইচ্ছা ছিল। তাঁর লেখা প্রহসন দুটি দেশজ উপাদান ও সমকালীন বাস্তবতায় উদ্ভাসিত। প্রহসন-রচনায় তিনি কথ্য ভাষার ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। উনিশ শতকের মানবিক মূল্যবোধ, বিশ্বসাহিত্যপাঠে উদার ও প্রসারিত বিশ্ববীক্ষা এবং মহৎ সৃষ্টির সাধনায় উন্মুখ শিল্পীসত্তা, এই ত্রিধারার সম্মিলনে বিকশিত হয়েছিল মধুসূদন দত্তের কবিমানস।

প্রতিভাবান ব্যক্তিরা যেমন তাঁদের সৃষ্টিমাহাত্ম্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন, তেমনি তাঁদের জীবনের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে সমালোচিত হন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের অলৌকিক কবিপ্রতিভা ও অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও চপলতা জড়িত ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন দত্তের চরিত্রের মহত্ত্ব, তেজস্বিতা, নিঃস্বার্থপরতা ও সরলতা প্রভৃতি গুণের সমাবেশ বিবেচনা করলে, তাঁর ত্রুটি–বিচ্যুতিগুলো অকিঞ্চিৎকররূপে প্রতিভাত হয়। তাঁর সম্পর্কে কৃষ্ণদাস পালের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: `With all his faults Mr. Datta was a remarkable man.'। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন: 'মাইকেল অদ্বিতীয় লোক ছিলেন; সেরূপ লোক আর দেখা যায় না।' পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ, ইউরোপের উৎকৃষ্ট ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁর মত স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিত্ব একান্তই দুর্লভ– এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

চিঠিপত্রে মধুসূদন দত্ত নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তাঁর বাংলা লেখায় তা পাওয়া যায় না। ব্যতিক্রম হয়তো *চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর* কয়েকটি কবিতা এবং তার বাইরে আত্মবিলাপের মতো কয়েকটি কবিতা। চিঠিপত্র সত্যিই মূল্যবান, তাঁর জীবন ও সাহিত্যরুচি বোঝাতে এর চেয়ে সহায়ক আর কিছু নেই। 'রেনেসাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষণ হল মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্তি এবং তার সম্যক অনুশীলন। মধুসূদনের প্রথম সনেট কবিমাতৃভাষা'য় সেই সত্যেরই প্রকাশ।' অল্প বয়সে ব্ল্যাংক ভার্সে সনেট লিখেছিলেন মধুসূদন দত্ত। মাদ্রাজ বাসকালে ইংরেজিতে ব্ল্যাংক ভার্সের চর্চা করেছিলেন। বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের প্রস্তুতিরূপে তা দেখা যেতে পারে। মধুসূদন দত্তের ইংরেজি রচনায় তাঁর সাহিত্যিক জীবনের একটি পর্যায়ের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পরবর্তীকালের সাহিত্যরচনার অনেক বীজ সেখানে পাওয়া যায়। সেসব রচনার নিজস্ব দোষগুণের উর্ধ্বে এই বীজরোপণের বিষয়টিও গুরুত্ব বহন করে। চিঠিপত্র অবশ্য তাঁর জীবনের পূর্বাপর পর্বের সৃষ্টি। তার গুণ সেদিক দিয়ে বিশেষ বলে চিহ্নিত করা যায়।

ড. ফেরদৌসী হক শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

নতুন
HARPIC
ALL IN 1
ট্রাই করেছেন কি?
কঠিনতম দাগ দূর করে
৯৯.৯% জীবাণু ধ্বংস করে
দূর্গন্ধ দূর করে
HARPIC
POWER PLUS
ALL IN 1

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা

সালেহা চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

পঁচিশ.

তারপর পান্নাভাই হারায়। হৃদয় গোপন করবার ইচ্ছে কিনা কে জানে। যে হৃদয় হঠাৎ দ্রিম দ্রিম করছে তাকে বশে আনা দরকার। বাইশ বছরের হৃদয় কি সবসময় কথা শোনে? একটু দিশেহারা, একটু বেবলগা। যাবতীয় 'স্পোর্টসম্যানশিপ' সত্ত্বেও এখন সে ধরা পড়তে পারে। জেনে যেতে পারে অনেকে হৃদয় এখন বশে নেই। মিঠুকে গুডবাই? ইহজীবনে নয়। কিন্তু ভাব করতে হবে এতে আমার কিছু যায় আসে না। এই তো নিয়ম। এই তো সভ্যতা। 'সুখে থাকো। আমার কবিতায় থাকো'। এমনি কোন বোধ। তবে এও চলে যাবে। জীবন বয়ে যাবে। বরফ গলে জল হবে। জীবনের ধর্মই বয়ে চলা, চারপাশের সবকিছু নিয়ে।

নিজের ঘরের নির্জনতার কারণে 'নির্ঝরের' উদ্দেশ্যে যাত্রা। তারপর আবার আসবে পান্না। এবং নিজে হেসে সকলকে হাসাবে। হৃদয়ে সুঁচ ফোটে এবং রক্তক্ষরণ হয়। কাজল জেনেছিল পিয়ালকে বিদায় দিয়ে। কাজল বাইরে আসে। যে শাড়ি মিঠুপা সঙ্গে নেবে না তেমনি একটি শাড়ি পরেছে ও। পোঁটলার মত। চুলগুলো তুলে এক ঢিপি খোঁপা বেঁধেছে। বাইরে পবিত্র। আর অন্যান্য দু'একজন। নিরিবিলি সুন্দর হয়ে উঠছে। অপরূপ হয়ে উঠছে। গান বাজছে ট্রানজিস্টারে। ব্যাটারিতে। বর ও বরযাত্রীরা আসবে ঢাকা থেকে। আগামীকাল সারাদিন এবং অনেকরাত পর্যন্ত গান বাজবে। বাইরের বড় ঘরে ঢালাও ফরাস পাতা। ধবধবে চাদর। তাকিয়া। এইসব। বিয়ের পরদিন মিঠুপা লঞ্চে ঢাকা চলে যাবে। মিঠুপা আর কখনো কাজলকে বকবে না। কি অপার স্বাধীনতা। ওদের বড় বাড়ি, অনেক মানুষ। হিজিবিজি সব ব্যাপার। আব্বা এত খোঁজ করেননি। ঘটকের চটকি কথায় সব ভুলে গেছেন।

কি মজারে মিঠুপা সিনেমা দেখতে তোকে টাকা দিতে হবে না। কাজলের উচ্ছ্বাসে মিঠুপা কেবল বলেছিল– রোজদিন সিনেমা দেখব নাকি?
কাজলকে দেখতে পেয়ে পবিত্র বলে– এমন শুকনো মুখে ঘুরছিস কেন?

শুকনো মুখ আবার কোথায়। ছড়ানো চেয়ারের একটিতে বসে ও। রঙিন শেকল বানানো শেষ। গেটের শেষ সাজ চলছে।

মিঠুদি যাবে তাই বুঝি মন খারাপ তোর?

হয়তো। বলে কাজল। –তোমরা সকলে বাড়ি সাজানোয় সোনার মেডেল পাবে।

তোর বিয়ের সময় এমন সাজাব দেখিস তখন।

আমার বিয়ে? হবেই না।

ভগিনী নিবেদিতা হওয়ার বাসনা নাকি? তা স্বামী বিবেকানন্দ পাওয়া যাচ্ছে কোথায়?

চেনা নেই জানা নেই হুট করে আর এক বাড়িতে যাও। ভাবতেই বিশ্রী লাগে। মিঠুপার মন খারাপ হবে না নতুন বাড়িতে গিয়ে?

হতে পারে। তবে ওটাই ওর আসল বাড়ি।

জানি। আমার ভাবতেই ভাল লাগে না।

তবু আজ না হোক, কাল না হোক, হয়তো পরশু, চাঁদ উঠবে ফুল ফুটবে তোর বিয়েও হবে।

হবে না। জানায় কাজল।

মঠবাসিনী হওয়ার আগে আমাকে ঠিকানা দিস।

পবিত্রদা তুমি কি শেষে স্বামী বিবেকানন্দ হতে চাও?

না। আমি বিয়ে করে, ভালবেসে জীবন কাটাতে চাই। ভণ্ডামী করে নয়।

জানি তোমার পাত্রী কে।

পাত্রী যেই হোক।

এই বলে পবিত্র কাজে মন দেয়। ট্রানজিস্টারের নব ঘোরায় কাজল। কি এক পচা হিন্দি গান বাজছে। 'ভিগা ভিগা হ্যায় শ্যামা' এসব শুনতে ভাল না। তবে কয়েকটা হিন্দিগান ওকে পাগল করে। যেমন– আয় মেরি দিলকে আওর চল আর ইয়ে রাত ইয়ে চাঁদনি ফির কঁহা/ সামঝা দিলকে দাস্তাঁ। এমনি কয়েকটি। চায়ের দোকানে বাজতে থাকলেও ওকে দোকানের সামনে থমকে দাঁড়াতে হয়।

ছাব্বিশ.

বৈশাখের পূর্ণিমা। বিয়ের তিন তারিখ ধার্য করবার সময় পূর্ণিমার কথা ভাবেনি কেউ। তবু ভালমেয়ে মিঠুকে চাঁদ ভালবেসে হাজির। ছাদে মেয়েদের আসর। থ্যাংকু চাঁদ– আকাশের দিকে তাকিয়ে কাজল বলে। তুমি না ভীষণ ভাল। ও চাঁদকে বলে।

নিচের কোলাহল উপরে আসে। বিয়ে বাড়ির কোলাহল। কাজল মমতা পারুল সবাই ছাদে। সবাই জমাট করে সেজেছে। শাড়িতে কাজলে আতরে পাউডারে ফুলে ও লিপস্টিকে এক একজন এক এক পরী। এ বলে আমাকে দেখ। ও বলে আমাকে। বড় দুলাভাই ছুটি নিয়ে এসেছেন। বুবু আসতে পারে নি। –আমি পাগড়ি পরে আসব নাকি ছোট গিন্নি। এমন সব রসিকতাও হয়েছে। কাজল মুখ ভেংচিতে উত্তর দিয়েছে। পরে বলেছে– নো চান্স। আমি আপনার জন্য সাজিনি।

সেতো জানি। প্রক্সি দিতে চাইছিলাম এই আর কি?

আমি আপনাকে কাল আরশোলা রেঁধে দেব। এত যখন সখ।

আমার পাগড়ি পরার ইচ্ছের সঙ্গে আরশোলার কি সম্পর্ক?

সম্পর্ক? আমার শাড়ির মতো রান্নার হাত কিনা সেটাও তো প্রক্সিম্যানকে দেখতে হবে।

গলায় প্রেমফাঁস পড়েছিস, খোঁপায় ফুল আমি কি করে চুপ করে থাকি।

আব্বা এসে পড়াতেই কথা শেষ। –এইযে বাবা দুলামিয়া, তিনি কি যেনো জানতে চান। বাবা দুলামিয়া আব্বাকে অনুসরণ করেন।

কাজল সোজা ছাদে। ছাদের জোছনা-আলোয় সকলকেই অপরূপ লাগছে। সকলেই সেজেছে আজ, কুমকুমের বাটি উপুড় করে, স্নো ঘসে, পাউডার মেখে, ঠোঁটে লাল রঙ মেখে। সকলের চুলে, খোঁপাতে ফুল। কাজলের চুলে বেলফুলের মালা। মমতারও তাই। মমতা বলে– বেশ লাগছে। কাজল বলে– তোকে অনেক বেশি ভাল। এসব নিয়ে একটু তর্কাতর্কি হল। কাকে বেশি ভাল লাগছে। আসার পথে দুলাভাই বলেছিলেন– আগলি ডাকলিং এবার রাজহাঁস। দুলাভাই মেয়েদের হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারশনের গল্প, গ্রিমস বাদার্সের গল্প পড়ে শোনান। আবার কখনো বই না দেখে বলেন। গল্প বলতে পারেন, নানা সব মজার ধাঁধাঁ জানেন। দুলাভাই আসলে এক মজার মানুষ। কাজল বলে– মনের মত রাজপুত্র পেলে কণ্ঠস্বর বিক্রি করে দেব ডাইনির কাছে। এবার হল? দুলাভাই কি বলতে চেয়েছিলেন, তার আগেই কাজল ছাদে।

মা ব্যস্ত কাজে, কথায়, আপ্যায়নে। মাঝে মাঝে মেয়ের শোকে চোখ মোছেন। বনাবনান্তরে ঘুরে বেড়ানো কাজলের দিকে চেয়ে ভাবছেন কি – একেও কি বেশিদিন ধরে রাখা যাবে? কি জানি কিযে মা ভাবছেন কে জানে।

বৈশাখী গরম নেই ছাদে। পেয়ারা গাছ থেকে, নারকেল গাছ থেকে বাতাস আসছে প্রচুর। এখানে অনেক খাবারের গন্ধ নেই, কটকটে আলো নেই, ভিড় যা আছে সে মনের মতো মানুষের। আর আছে চাঁদ, বোনাস এক ঘটনা।

আকাশটাও তারায় তারায় জ্বল জ্বল করছে। আর সোনার থালার মত সুবর্ণ চাঁদের পাশে ফুটকি ফুটকি তারার মালা। তাকিয়ে দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। এরপর সকলের ইচ্ছায় গান শুরু হল। প্রথম গান মমতার। ও গান শেখে। –জীবন যখনি শুকায়ে যায়– শুরু করে ও। কি নিবিড় কণ্ঠে। কি আশ্চর্য কাজ ওর গলায়। গান শেষ হলে শোনা গেল পান্নার কণ্ঠস্বর– কর্ম যখন প্রবল আকার/ গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার/ এইটুকু বলবার পরেই সকলে তাকায় পেছনে। ওর সাজটাই বা কম কি? নরম গরদের পাঞ্জাবি আর কালচে ওয়েস্টকোট এবং চুল সাবান ঘসা, শাম্পু করা।

আপনি?

রবাহূত। প্রমিলারাজ্যে। তাড়াবে না আশা করছি।

তাড়াব না যদি গান করেন?

কাজলের দিকে তাকিয়ে বলে– এইটি আমাদের কাজল নাকি? চেনাই যায় না দেখছি। কাজল মুখ রাখে মমতার কাঁধে। সকলের সমবেত অনুরোধে গাইলেন– মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী/ দেবো খোঁপায় তারার ফুল। পারুল কাজলের কানের কাছে মুখ এনে বলে– তারার ফুলের মালার লোভ দেখিয়ে তুমি আর কি করবে পান্নাভাই। এতো গন কেস।

চুপ। তুই খুব বাজে বকিস। মমতারা জানায় পান্নার গলা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মত। এরপর সকলে ধরে কাজলকে। ও রেডিওতে গান শোনে। রেডিওতে গলা মেলাতে পারে। আর বাথরুমে গলা খুলে চিৎকার। কিন্তু এই সভায় গান? কি করে তা সম্ভব। যে করেই হোক গাইতেই হবে। অতএব দ্রুত লজ্জিত গলায় কাজল ও শিমূল বন গেয়ে বা বেশ হয়েছে প্রশংসা কুড়োয়।

যেতে যেতে কাজলের মাথা থেকে গোটা দুই বেলফুল নিয়ে নেয় পান্নাভাই। কাজল জানতেও পারে না।

নিচে থেকে খবর এল শাহনজর শুরু হয়েছে। সবাই ছুটল নিচে। দুরদার পায়ে। মস্ত সুটকেস ভর্তি শাড়ি আর বিলাতি প্রসাধন এসেছিল ওদের বাড়ি থেকে। সে সবে মিঠুপা এখন রাজকন্যা। ঝলমল করছে। আসরের মাঝখানে নিচুমুখে বসে। মিঠুপার কলেজের বান্ধবীরা, সেজদি সকলে মিলে সারা সন্ধ্যা ধরে সাজিয়েছে। মুখ চন্দন চিত্রিত। ওদের মুখের সামনে মস্ত আয়না ধরে জিজ্ঞাসা করা হল– কি দেখছেন? ডাক্তার দুলাভাই একটু ভেবে বলেন– ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি ও রক্তশূন্যতা নেই, বোধহয় লিভার ফাঙ্শন ভাল। আয়নাধরা ভাবী বলেন– ও মশায় আপনি রোগী দেখছেন না বউয়ের মুখ দেখছেন এ কথা ভুলে যাবেন না। অতএব দুলাভাই এবার ঠিকঠাক হয়ে বসে বলে– আয়নায় স্থলপদ্মের মত যে মুখ ভেসে আছে সেই কি আমার বউ? তাহলে বলি এযে একেবারে পূর্ণিমার চাঁদ। ব্যাস। হয়ে গেল। পূর্ণিমার চাঁদ আর ডাক্তার সরবত খেল ভাগাভাগি করে। মিঠুপার চুড়ি বালাপরা হাত একটু সন্দেশ তুলে ধরল দুলাভাইয়ের মুখে। আর দুলাভাই বাকি অর্ধেক মিঠুপার মুখে।

সরবত খাওয়ানো, মিষ্টি খাওয়া সব শেষ হল। কিন্তু মিঠুপাকে কেউ প্রশ্ন করল না তুমি কি দেখছো ধুমকেতুর মত এই মানুষটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা। এমন প্রশ্ন কাজলের ছেলেবেলায় মেয়েদের করবার নিয়ম ছিল না। মেয়েদের জন্য বাবারা তোলপাড় খোঁজে জমিজমা, ঘটি-বাটি বন্ধক দিয়ে ছেলে ধরে আনতেন। প্রেম করে বিয়ে? প্রশ্নই ওঠে না। তবু কিন্তু প্রেম হত। প্রেম! সে যে হাজার বছরের নদী! একবার পান্নাভাই বলেছিলেন।

আসর থেকে পান্না চলে গেল। নিচু মুখে। হেঁটে গেল নিঃশব্দে। দাঁড়িয়ে ছিল দরজার কাছে। সকলের পেছনে। কাজল চেয়ে দেখে। পান্নার ওয়েস্টকোটের পকেটে ছাদের মেয়েদের মাথার বেলফুল। কাজলের মমতার।

রাতে মার পিঠে মুখ ঘসে কাজল বলে– মা আমি আজ কোথায় ঘুমাব?

মা বারান্দার খুঁটি ঠেঁস দিয়ে চোখ মুছছিলেন। কিছু বলেন না। কাজল মার পিঠে মাথা রেখে মার শাড়ির কোরা গন্ধ শুঁকে সেখানেই ঘুমিয়ে গেল বোধহয়।

সাতাশ.

আজ এই দিনটাকে
মনের খাতায় ভরে রাখো
আমায় পড়বে মনে
কাছে দূরে যেখানেই তুমি
থাকো।

ঠিক এমনি একটি কবিতা লিখল পান্না।

নিজের ঘরে অনেকবার তেমনি এক গান গুন গুন করে পান্না। নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি খুলে রাখে। বিছানায় শুয়ে চেয়ে দেখে 'নিরিবিলি'র আলো জ্বলছে ও নিভছে। ও বাড়ির বহুবর্ণের আলো। দেখতে দেখতে চোখ ধরে এসেছে, ঘরে ঢোকে পারুল। চোখ মেলে বলে পান্না– কি খবর ঘসেটি বেগম?

কিছু খবর নেই।

পান্না জানে ওকে দেখতে এসেছে পারুল বোন। কেমন আছে পান্না, কি করছে পান্না এইসব। কোন মজার কথায় ভোলাবে সে আহত ভাইকে এমনি কোন সুন্দর মতলব মনে। বাবার ব্যবসায় চালাতে পান্নার এখন আর কোন আপত্তি হবে না। সেতো আর কখনো কলেজে মিঠুপার পেছনে বসতে পারবে না। আর সেই কারণে ব্যবসার কাজ দেখব আরো দুই বছর পরে, এমন কিছুও বলবে না। কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে মিঠুর রিকশার যাওয়া আসা দেখবে না। কখনো এ বাড়িতে এসে হঠাৎ মিঠুর দেখা পেয়ে আনন্দিত হবে না। 'আমি ওর যোগ্য হব' এমনি কোন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আজ থেকে আর নেই। এখন বেশ বড়সড় ব্যবসায়ী হয়ে উঠবে পান্না। মিঠুদের জগৎ পড়াশুনার জগৎ। তাই সে পড়বে বলে জীবনপাত করছিল, বাবার সব শাসনকে উপেক্ষাও করছিল। টেবিলের মায়ার্স, ভোলানাথকে এক হাতে সরিয়ে সেখানে রেখেছে বিয়েবাড়ির পাঞ্জাবি। বেশ হাওয়া দিচ্ছে বাইরে। এখন আর গুমোট নেই। মমতা পারুল কাজলের পুকুরে চাঁদ ভাসছে। ওরা যেখানে গল্প করে, কথা বলে সেই নিথর পুকুর। কি এক অসমাপ্ত কবিতা টেবিলে।

এ্যাই পান্নাভাই চা খাবি?

এতরাতে চা খাব, কারণ?

কারণ কিছু না।

তুই কখন এলি?

খানিক আগে। ডাক্তার ভদ্রলোককে এক গ্লাশ লবণের সরবত খাইয়ে। এই বলে পারুল হাসে। মার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া জড়িপাড় বেনারসি আর মালাতে পারুল দারুণ। এইটা তাহলে খুব তাড়াতাড়ি বিদায় হবে। মনে মনে ভাবে। পান্না বলে– এতরাতে আমি চা খাব কিনা এ খবর নিতে আমার ঘুম কাতুরে বোন এ ঘরে? আর কোন কারণ?

এক রাত না ঘুমালে কি হয়?

কিছু না। কিন্তু আমি ঘুমাতে চাই। এসব মানবিক কারণ পান্নার এ মুহূর্তে পছন্দ নয়। ও সত্যিই একা থাকতে চায়, জেগে ও ঘুমিয়ে। পারুলকে প্রায় ঠেলে বাইরে পাঠিয়ে বলে– গুডনাইট।

বড় বড় পা ফেলে পারুল চলে যায়। আহত, বিধ্বস্ত ভাইকে সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে। রাগ তো হবেই। সকাল হতে কয়েক ঘণ্টা বাকি। তারপর ওদের ট্যাপাখোলার লঞ্চঘাটে পৌঁছতে হবে। কোথাকার এক মেঘ এসে ঢেকে দেয় চাঁদ। মেঘ। তারপর ঝড়ের শব্দে একসময় চোখ বন্ধ করে পান্না। ঘুম বাঁচিয়ে দিল ওকে। পারুল কি ওকে এমন 'হিলিং বামে' ঘুম পাড়াতে পারত? মমতা, পারুল, কাজল সকলকে মনে করে একসময় ঘুমে বিভোর হয় ও। ওয়েস্টকোটের পকেটে কার যেন খোঁপার বেলি ফুল। কার যেন? ও মনে করতে পারে না।

পারুল একসময় ঘুমিয়ে গেল ছটফট করতে করতে।

আর ও বাড়িতে কাজল? ঘুমে বালিশ। মনে মনে বলে পারুল 'ফোর আওয়ার্স টু ডন'। আর পান্না হয়তো ভাবছে– ফোর আওয়ার্স টু এ ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড।

আটাশ.

সকাল হবে না এমন কোন রাত আছে? তাই নিয়মমত সকাল হল। পান্নার মনে পড়ল ওদের পৌঁছতে হবে ট্যাপাখোলার লঞ্চ ঘাটে। এবারে ট্রাউজার আর পুলোভার পরল ও।

সকলের চোখের জলের মধ্যে চোখ মুছতে মুছতে মিঠুপা গাড়িতে উঠল। পাশে দুলাভাই। বিয়ের বর বর পোশাক নেই। তাই অনেক সুশ্রী আর স্মার্ট লাগছে। নিজের অন্যপাশ দেখিয়ে বলে– কাজল বস। কাজল বলে– আপাতত বউ নিয়েই বাড়ি যান।

কেন ফাও কি এমন কাজে ব্যস্ত আমার সঙ্গে যেতে পারবে না।

অনেক কাজ আমার। বলে কাজল গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। বলে আরো– আমাকে নিয়ে গিয়ে কিছু লাভ নেই। আমি কেবল লবণের সরবত বানাতে পারি। কাল রাতে টের পাননি। এরপরে এলে আরশোলার রোস্ট আর ব্যাঙের বিরিয়ানি।

কুছ পরোয়া নেহি। এরপরে এলে ডায়ারিয়া ট্যাবলেট সঙ্গে আনব। ঠিক আছে?

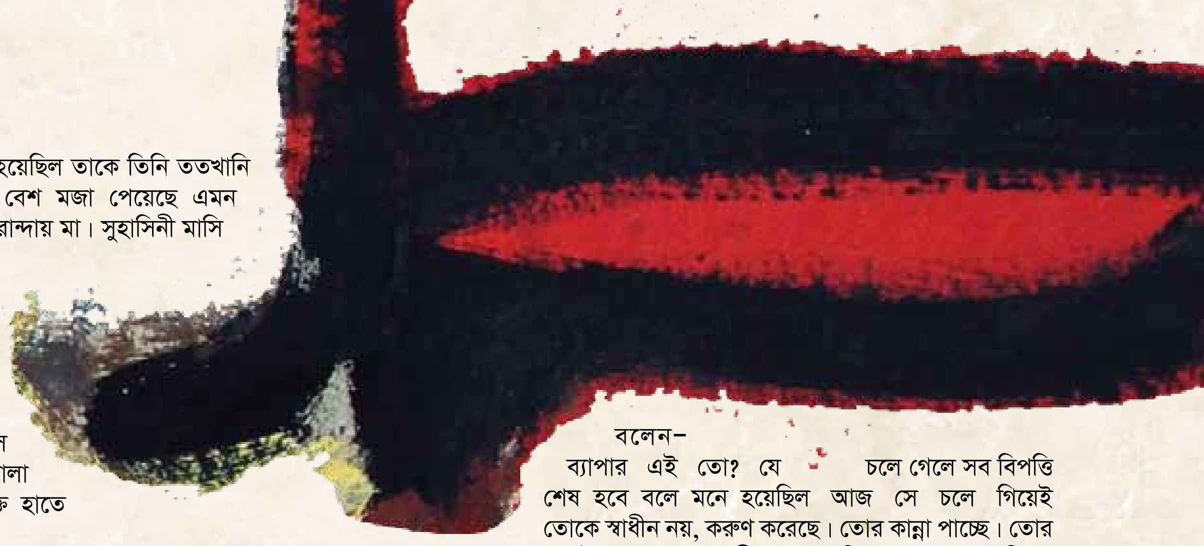

যতখানে গম্ভীর মনে হয়েছিল তাকে তিনি ততখানি গম্ভীর নন। আর সকলে বেশ মজা পেয়েছে এমন কথাবার্তায় বোঝা যায়। বারান্দায় মা। সুহাসিনী মাসি তাকে ধরে রেখেছে।

লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত যেতে অসুবিধা নেই। তাই একসময় দুলাভাইয়ের পাশে উঠে বসে কাজল।

মিশন স্কুল পার হয়ে, পুলিশ ফাঁড়ির ধার ঘেসে গাড়ি চলেছে। ট্যাপাখোলা রোড ধরে। পান্নাভাই শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে আছে।

ঘাটে পৌছেই পান্নাভাই জানান আমাকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে। কাজল বলে ও পরে যাবে। আব্বার সঙ্গে।

সেই ভাল। পান্নাভাই হেসে বলে। দুলাভাইয়ের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে। কাজল দেখেছে সেই ছোটো পুল পার হতে দুলাভাই মিঠুপাকে সাহায্য করেছে। মিঠুপার মেহেদী পরা হাত দুলাভাইয়ের হাতের মুঠিতে বড় নিশ্চিন্তে স্থান করে নিল। আর এই দৃশ্য পান্নাও দেখেছে। তাই কি বলা– আমি এবার যাই? ঠিক তা নয়। সত্যিই কাজ আছে তার। ‘পাপিয়া আটা মিল’ না হলে ‘পারুল গ্রোসারি’র বিবিধ কাজ। মিঠুপার দিকে তাকিয়ে বলে– চললাম মিঠু। মিঠুপা মাথা নাড়ে। পান্নাভাই চলে যায়।
চলি ডাক্তার সাহেব।
পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।
আমিও। পান্নাভাই বলে।
পাড়ে নেমে হাত নেড়ে ফেয়ারওয়েল জানাল।

লঞ্চ ঢাকার দিকে রওনা দেবার পর ফিরে এল কাজল। –ভাল হয়ে থাকিস কাজল। দুষ্টুমি করিস না। আব্বার কাপড় গুছিয়ে দিস। মার কথা শুনিস। মাথা নেড়ে কাজল জানায় সে সব কথা শুনবে। সে ভাল মেয়ে হবে। দুষ্টুমি করবে না।

তুই ভাল থাকিস মিঠুপা। বলতে গিয়ে কাজলের গলা ধরে এল।

মাথা নেড়ে মিঠুপা জানায় সেও ভাল থাকবে। নিচের একটি কেবিন মিঠুপার জন্য ঠিক করা হয়েছে। সেখানে বারকয়েক ফ্ল্যাশবাতির ক্যামেরা ঝলসে ওঠে। মিঠুপার একার। মিঠুপা ও দুলাভাইয়ের। কাজল মিঠুপা ও দুলাভাই।

আসি তাহলে।

আয়। টলটলে জলভরা চোখ। কাজল মুছে গালে পড়ে। বলে আবার– আয়। ঘোমটা একটু সরেছে। অর্ধেক চাঁদের মত টিকলি কপালের উপর।

দরজার ওপারে কাজল হারায়। জানালায় চোখ রাখলে কেবল চোখে পড়ে নদী আর নদীর স্রোত। মিঠুপা নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। টপ টপ টপ। নদীতে কতজল। কে ওর সেই টপটপের হিসেব করে।

শূন্যঘর মিঠুপার। মন কেমন করে, ‘মন কেমন করে’র সুর সারা মনে। এ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অনড় কাজল। খাটে ছাড়া কাপড়। ড্রেসিং টেবিলে কুমকুমের মুখ খোলা। কিউটিকুরা পাউডার। পাফ। মিঠুপার গোছাল টেবিলটা বিশ্রীভাবে অগোছাল। দেয়ালে মিঠুপার মুখের ছবি। গ্লাসে ভিজে থাকা গতরাতের বাসি ফুল। মিঠুপা এখন ঢাকায় থাকবে। বড় বাড়িতে। অনেক মানুষের মধ্যে। একটি ছবি রতন স্টুডিওর ছেলেটি তুলেছিল গতবছর। ওর আর মিঠুপার। নারকেল গাছের ছায়ায়। সেটি দেয়ালে বাঁধানো। হাত দিয়ে ছবি ছুঁয়ে দেখে কাজল। যে ঘর সবসময় শোভন আর পরিপাটি তাকে এ মুহূর্তে বড় অশোভন লাগে। সেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, অবাধ স্বাধীনতার সুখেই বোধকরি হুঁ হুঁ করে কেঁদে ওঠে কাজল– মিঠুপা মিঠুপারে।

কি হচ্ছে ছোট গিন্নি। দুলাভাই এসে দাঁড়িয়েছেন পাশে। বিষাদী কাজল শুনতে পায়নি কোন পায়ের শব্দ। দুলাভাই পিঠে হাত রাখেন। বলেন–

ব্যাপার এই তো? যে চলে গেলে সব বিপত্তি শেষ হবে বলে মনে হয়েছিল আজ সে চলে গিয়েই তোকে স্বাধীন নয়, করুণ করেছে। তোর কান্না পাচ্ছে। তোর বুকে কষ্ট হচ্ছে। আমরা কী সবসময় নিজেকে বুঝতে পারি রে কাজল?

কাজল দু'হাতে চোখ ঢেকে মাথা নাড়ে। দুলাভাই বসেন চেয়ার টেনে। বলেন এইতো মিঠু আবার আসবে। অবশ্য তারপর ওর আসাটা অনিয়মিত হবে। তুইও ঢাকাতে বেড়াতে যেতে পারবি। কাজল দু'হাত সরায় মুখ থেকে। দুলাভাই সেদিকে তাকিয়ে বলে– কেঁদে কেঁদে চেহারা হয়েছে দুধ চুরি করা কালিমাখা বেড়ালের মত। বিশ্বাস না হয় আয়নায় দেখ। কাজল ওড়নায় চোখ মোছে।

শোন কাজলী এই পৃথিবীর গল্প হল যাওয়া আর আসা। কাজল জানে এই যাওয়া আসার গল্প। যে গল্প পান্নাভাইও করে। আসলে আমরা যা ভাবি সেটা যখন ঘটে দেখা যায় সেই ঘটনা আমাদের পছন্দের নয়। এই মুহূর্তে তোর মনের অবস্থা সেই মত তাই না? তারপর একদিন এই বাড়িতে সেই অনুপস্থিতিই স্বাভাবিক হবে।

আমি সারাদিন ঝগড়া করতাম। আমি সারাদিন চাইতাম ও চলে যাক– এই বলে আবার কেঁদে উঠতে চাইল কাজল।

জানি। আমি আর তোর বুবু যখন ঝগড়া করি মনে হয় এগুলো জীবন থেকে চলে গেলেই শান্তি। কিন্তু যখন চলে যায় একঘণ্টা পরেই মন খারাপ। তারপর দুর্বিসহ অবস্থা।

দু'জনে এরপর বসে রইল চুপচাপ খানিকসময়। কাজল একটু স্থির হয়ে বলে আপনি নাকি কালই চলে যাবেন।

কালই। পোস্টঅফিসে কতদিন ঝাঁপ ফেলে রাখা যায়? অনেক কষ্টে ছুটি পেয়েছি। কালই যেতে হবে।

কাজল বলে– এত বিশ্রী চাকরি কেন আপনার?

উপায় নেই। এখন ইচ্ছা করলেই আর ভাল চাকরি পাওয়া যাবে না। তোর মিঠুপা নিশ্চয়ই অনেক উপদেশ দিয়েছে। সেসব মেনে চলতে হবে। আর কাঠবেড়ালিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাছে-টাছে ওঠার অভ্যাস কমাতে হবে। এ ছাড়াও আরো নানা অভ্যাস। এই ভাবে ‘প্রসেস অফ ইলিমিনেশনে’ শুদ্ধতর কাজল।

কাজল হাসে। বলে– শুদ্ধতম বা শুদ্ধতর কাজল হতে চেষ্টা করব।

চেষ্টার কিছু নেই। ও এমনিতেই হয়ে যাবি। তোর বুবু, মিঠু এদের পদাংক অনুসরণ, হবেই। তবে তোর এই গাছ-পাখির ভালবাসা ওদের চাইতে ভিন্ন। তাতে নিজেকে দোষী ভাবছিস কেন? কে জানে এই সব গাছ তোকে কোন জগতে নিয়ে যায়।

মানে আব্বার মত কবি?

নট আনলাইকলি। আশ্চর্য হব না। তাতে দোষ নেই কোন।

দুলাভাইকে কি বলতে আব্বা এলেন এ ঘরে। কাজলের মনে হল মা এই ফাঁকে রীণু মিনু ও চুমকির জন্য যে তিনখানা সোনার কানের রিং বানিয়ে রেখেছেন, হয়তো সেগুলো দুলাভাইকে বুঝিয়ে দেবেন।

দুলাভাই চলে গেল পশের ঘরে। কাজল আয়নায় কাজল ঠিক করে। পেছনে মিঠুপার মুখ, ঢল ঢল কাজল আঁকা। তাকিয়ে দেখছে কাজলকে।

● পরবর্তী সংখ্যায়

সালেহা চৌধুরী
প্রবাসী কথাসাহিত্যিক

ছবিমোড়া পাহাড়

ভ্রমণ

প্রাণের দোসর আগরতলা

হাবিবুর রহমান স্বপন

অনেক দিনের ইচ্ছা আগরতলা যাওয়ার। এই আগরতলার মানুষজনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সকল প্রকার সহযোগিতা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাই তাঁকে বিশাল নেতায় পরিণত করেছিল। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন ভারতের একটি রাজ্যের রাজধানী। কোন রাজ্যের রাজধানী বাংলাদেশের এত কাছে আর নেই। আরও একটি আগ্রহ এই ত্রিপুরা রবীন্দ্রনাথের খুবই প্রিয় ছিল। এ কারণেই তিনি সাতবার ত্রিপুরা গিয়েছিলেন।

আমার কাছে মনে হয়েছে আগরতলার মানুষেরা আমাদের বাংলাদেশীদের মতই অতিথিপরায়ণ। কলকাতার বা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের চেয়েও ওরা বাংলাদেশীদের বেশি প্রিয়। ওরা কথা বলে ঢাকাইয়াদের মত এবং বৃহত্তর কুমিল্লার মানুষের ভাষায়। খাদ্যাভ্যাসও আমাদের মতই।

বন্ধুবর কবি ওবায়েদ আকাশের সঙ্গে আগরতলা যাওয়ার একটি সুযোগ মিলল। ২৪ মে সকাল আটটায় বিআরটিসি বাসে কমলাপুর থেকে আমরা রওনা হলাম। বাংলাদেশ সময় দুপুর দেড়টায় আমরা আগরতলা পৌঁছলাম।

প্রচণ্ড গরম। আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে সীমান্তে এসেছিলেন ত্রিপুরার প্রতিভাবান তরুণ কবি প্রদীপ মজুমদার।

ভোর পাঁচটায় আগরতলার সূর্যোদয় দেখতে বেরুলাম। সড়কে যানবাহন নেই। সুন্দর পরিপাটি গাছপালায় ভরা শহরের কয়েকটি সড়কে হাঁটলাম। সকালের আগরতলা বেশ ভাল লাগল। সাড়ে ন'টায় রওনা হলাম উদয়পুরের উদ্দেশ্যে। চারশো বছর আগে উদয়পুরই ছিল ত্রিপুরার রাজধানী। অমরপুর থেকে রাজধানী উদয়পুরে স্থানান্তর করা হয়। এখানেই রয়েছে মাতৃমন্দির। যে মন্দিরে নরবলি হত। এখানকার কাহিনিকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন *বিসর্জন* নাটক।

তার ব্যক্তিগত গাড়িতে শহরের প্রধান সড়কে অবস্থিত হোটেল লংত্রাইয়ে পৌঁছলাম। সুন্দর পরিপাটি হোটেলটি। তবে আমার জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষের এয়ার কন্ডিশনারের বিকট শব্দ বিশ্রামের বিঘ্ন ঘটাল। সামান্য সময় বিশ্রাম নেয়ার পর প্রদীপ আমদের নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। সেখানেই দুপুরের খাবার খেয়ে আবার হোটেলে বিশ্রাম। সন্ধ্যায় এলেন ত্রিপুরার প্রবীণ কবি-লেখক রাতুল দেববর্মণ (সঙ্গীতজ্ঞ শচীন দেববর্মণের বংশধর)। তিনি আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটালেন এবং পরে আসবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন। কিছুক্ষণ পরেই এলেন আকবর আহম্মদ, শ্যামল ভট্টাচার্য, মৃদুল দেবরায় ও প্রবুদ্ধসুন্দর কর। নিজেদের লেখনীতে এঁরা সকলেই ত্রিপুরায় স্থান করে নিয়েছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হল। রাত এগারটা পর্যন্ত চলল সাহিত্যের আড্ডা। এয়ার কন্ডিশনারের বিকট শব্দে কোনরকম ঘুম হল– যাকে বলা চলে ব্রেক বা ড্রপ ঘুম।

ভোর পাঁচটায় আগরতলার সূর্যোদয় দেখতে বেরুলাম। সড়কে যানবাহন নেই। সুন্দর পরিপাটি গাছপালায় ভরা শহরের কয়েকটি সড়কে হাঁটলাম। সকালের আগরতলা বেশ ভাল লাগল। সকাল আটটার আগে দোকানপাট খোলে না কেউই। সাড়ে ন'টায় আগরতলা রাজ্য টেক্সট বুক বোর্ডের সদস্য লেখক আকবর আহম্মদ এলেন তাঁর গাড়ি নিয়ে। আমরা রওনা হলাম উদয়পুরের উদ্দেশ্যে। চারশো বছর আগে উদয়পুরই ছিল ত্রিপুরার রাজধানী। অমরপুর থেকে রাজধানী উদয়পুরে স্থানান্তর করা হয়। এখানেই রয়েছে মাতৃমন্দির। যে মন্দিরে নরবলি হত। এখানকার কাহিনিকে কেন্দ্র করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন *বিসর্জন* নাটক। উদয়পুর যাওয়ার পথে বিশালগড় বাজারে নামলাম। প্রায় প্রতিটি দোকানে দেখলাম বাংলাদেশী পণ্য– সাবান, সিগারেট, জুস ইত্যাদি। চা পান করে আবার রওনা হলাম উদয়পুরের উদ্দেশে। পথিমধ্যে আমরা নামলাম সিপাহীজলা ফরেস্ট-এর সাফারি পার্কে। অনেকবকম হরিণ ও প্রাণী দেখলাম। খুবই কাছে গিয়ে দেখলাম মায়া হরিণ শাবক। সমান্তরাল ফসলের খেত ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ি চলল টিলাপথে। বারোভাইয়া নামক স্থানে মহাসড়কের ধারে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনির সদস্যরা যানবাহন ঠেকিয়ে যাত্রীদের বিশুদ্ধ জল এবং সরবত দিচ্ছিলেন। আমাদেরও দেওয়া হল। তৃষ্ণা নিবারণ হল। সামনে অগ্রসর হল আমাদের যানবাহন। দু'ধারে শাল-গর্জন বৃক্ষ। উঁচু-নিচু পথ পেরিয়ে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে টেপানিয়া ইকোপার্কে নামলাম। সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ কবি বিমল বণিক ও অশোক দেব হাসিমুখে হাত বাড়ালেন। আমাদের দেখানো হল 'ট্রি হাউজ'। গাছের উপর ঘর। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর ওদের রেস্টুরেন্টে দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা হল।

বিকাল চারটায় আমরা পৌঁছলাম অমরপুর। এটি ত্রিপুরার প্রাচীনতম রাজধানী। এগারশো বছর আগে এটি ছিল ত্রিপুরার রাজধানী। এখানকার একটি গল্প অবলম্বনেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন *মুকুট* নাটক। ত্রিপুরার বিশিষ্ট কবি সমরজিৎ সিংহ আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন পর্যটন কর্পোরেশনের গেস্ট হাউজে। বিশাল দীঘির উত্তরে মনোরম পরিবেশে সুন্দরতম গেস্ট হাউজটির আসবাবপত্র সবই বাংলাদেশের একটি আসবাবপত্র প্রতিষ্ঠানের। বিকাল বেলাটা আমাদের ভালই কাটল। সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন ভারতীয় সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক *দৈনিক সকাল বেলার* নির্বাহী সম্পাদক শ্যামল ভট্টাচার্য। তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আগরতলা থেকে অমরপুর আসেন। সন্ধ্যায় অমরপুর বাজারের পাশে ছোট্ট একটি মাঠে নজরুলজয়ন্তী পালন অনুষ্ঠান। আয়োজক সমরজিৎ সিংহ। তিনি আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। বিদ্যুৎ না থাকায় অনুষ্ঠান বিলম্বিত হচ্ছিল। প্রধান অতিথি বিধানসভার সদস্য মনোরঞ্জন আচার্য। অতিথির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন সমরজিৎ সিংহ। বিধায়ক মনোরঞ্জন আচার্য কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধনের সময় তিনি আমাকে এবং কবি ওবায়েদ আকাশকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে মাইকে ঘোষণা করা হল আমাদের নাম। আমরা বিব্রত হলাম। এরপরেও আমাদের কিছু কথা বলতেই হল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা নজরুলসঙ্গীত পরিবেশন করলেন। ছোট ছেলেমেয়েরা সুন্দর গাইল। রাতে সমরজিৎ সিংহের বাড়িতে আমাদের উদরপূর্তি হল। সমরজিৎবাবুর স্ত্রী প্রীতি আচার্য খুব ভাল রাঁধুনী। তিনি কবিও বটে। অনেক রাতে ঘুমোতে গেলাম– এখানেও বিদ্যুৎ বিভ্রাট! সকালে আমরা রওনা হলাম ছবিমোড়া পাহাড়ের দিকে। একটি ব্যক্তিগত

ত্রিপুরা রাজবাড়ির অভ্যন্তরের শিল্পকর্ম

সিপাহীজলা ফরেস্ট লেক

গাড়িযোগে বনের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পিচঢালা সরু পথে যাত্রা। প্রায় বারো কিলোমিটার পাহাড়ি পথে আমাদের গাড়ি চলল। জঙ্গল-পাহাড়ের মধ্যে দেববাড়ি বাজারে সকালের নাস্তা পরোটা ও ডিম। উপজাতীয় এক যুবক ও তার স্ত্রী দোকান চালান। আমাদের প্রত্যেককে তিনটি করে ডিম মামলেট দেওয়া হল। এত ডিম কেন? প্রশ্ন করায় দোকানদার রেগে গেলেন। আমরা আর কথা বাড়ালাম না। গোমতী নদীর তীরে চাক্রাক্মা তীইবঙ (খাদ্য দেবী) ঘাট থেকে কোষা নৌকায় উঠলাম। আমাদের গাইড পাহাড়ি উপজাতীয় জমাতিয়া সম্প্রদায়ের নেতা অষ্টমোহন। নৌকার মাঝি অনন্ত গোপাল। গোমতী নদীর স্রোতের অনুকূলে আমাদের নৌকা চলল প্রায় চল্লিশ মিনিট। কিছু দূর যাবার পরই বিস্ময়ে হতবাক হলাম। পাহাড়ের গায়ে ছবি আঁকা হয়েছে নিখুঁত। তিন স্তর বিশিষ্ট ছবি। রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে পাহাড়ের গায়ে আঁকা দেব-দেবীর ছবি। প্রায় বারোশো বছর আগে আঁকা এসব ছবির অনেকগুলোই ধ্বংস হয়ে গেছে। এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল প্রাচীনকালে রাজারা নদী পথে যাতায়াত করতেন। রাজাদের চিত্তবিনোদন বা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সন্তুষ্টিবিধানের জন্যই তৎকালীন সময়ের আঞ্চলিক জমিদার ও মহলদাররা শিল্পীদের দিয়ে পাহাড়ের গায়ে টেরাকোটার মত ছবি এঁকেছেন। অপূর্ব সব ছবি। যাবার সময় ছিল স্রোত অনুকূলে। এবার ফেরার পালা স্রোতের প্রতিকূলে। সময় লাগল তিন গুণ। নদীতে হাতড়িয়ে মাছ ধরতে দেখলাম উপজাতীয় যুবকদের। কি বলিষ্ঠ শরীর। ওরা খুবই পরিশ্রমী। আইড় এবং রিঠা মাছ পাওয়া যায়। বেশ কয়েকটা ধরতে দেখলাম।

গোমতী নদীর উৎপত্তিস্থল আঠারো মোড়া পাহাড়। এর দুটি ঝর্নাধারা রাইমা ও শরমা থেকে গোমতী নদী প্রবাহিত হচ্ছে। গোমতী নদীর ৪২ মাইল ভাটিতে ভারত ষাটের দশকে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। এর পর আরও প্রায় ৩৫ কিলোমিটার ভাটিতে রানীর বাজারে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করা হয়েছে রানীর বাঁধ। এখান থেকে ফিডার ক্যানেলে সেচের জন্য পানি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ত্রিপুরার সমতল ভূমিতে। ভাটিতে পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ায় এক সময়ের খরস্রোতা গোমতী নদী এখন মৃতপ্রায়। ত্রিপুরার বিশালগড় হয়ে বাংলাদেশের কুমিল্লার কংশনগরে প্রবেশ করেছে গোমতী।

দুপুরে আগরতলা ফিরলাম। ফেরার পথে আঁকাবাঁকা সড়কের দু'ধারে দেখলাম বিশাল বিশাল সেগুন গাছ। শতবর্ষী না হলেও ওগুলোর বয়স তার কাছাকাছি তো বটেই। এদেশে কি গাছখেকোরা নেই? সড়কপথের প্রায় ৫০ কিলোমিটার এমন দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। এ এলাকার ভূমির গঠন আমাদের পার্বত্য এলাকার মতই।

আগরতলায় ফিরে আমরা নতুন অতিথিশালায় উঠেছি। শহরের ব্যস্ত সড়ক থেকে একটু ভেতরে রয়েল গেস্ট হাউজ। বেশ সুন্দর। এটিরও আসবাবপত্র বাংলাদেশের একটি কোম্পানির। সন্ধ্যায় কবি-সাহিত্যিকরা এলেন। ত্রিপুরার প্রখ্যাত কবি সেলিম মোস্তফা, কৃত্তিবাস চক্রবর্তী, প্রবুদ্ধসুন্দর কর ছাড়াও তরুণ কবি আকবর আহম্মদ, পল্লব ভট্টাচার্য ও প্রদীপ মজুমদার। লম্বা আড্ডা জমল। আধুনিক কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ নিয়ে চলল নাতিদীর্ঘ আলোচনা। ওরা আসার সময় সবাই কিছু খাবার নিয়ে এসেছেন। পরিমাণে অনেক। রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত চলে আড্ডা।

পরদিন সকালবেলাটা আমাদের কাটল ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশাল প্রতিকৃতি উদ্বোধন করেছেন। গাছপালায় ভরা বিশাল ক্যাম্পাস। সুন্দর পরিবেশ। এর পর বাজার-দোকানপাট ঘুরে দেখলাম, কিছু কেনাকাটা করলাম। প্রায় প্রতিটি দোকানেই বাংলাদেশের পণ্য। বিশিষ্ট সাহিত্যিক রাতুল দেববর্মণ জানালেন স্থানীয় মানুষজন বাংলাদেশের পণ্য দারুণ পছন্দ করে। ত্রিপুরা সরকার শহরে একটি জমি দিয়েছে বাংলাদেশকে। যেখানে নির্মিত হচ্ছে বাংলাদেশী মার্কেট। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ফোরাম বেশ আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। দুপুরে রাতুল দেববর্মণের বাড়িতে ছিল আমাদের নিমন্ত্রণ। খাবার টেবিলেই কথা হচ্ছিল। বিকালে দেখলাম রাজবাড়ি। দেড়শো বছরের প্রাচীন রাজবাড়ির সংস্কারকাজ চলছে। বিকালে কপোত-কপোতীদের ভীড়ে মুখর রাজবাড়ির আঙিনা। বেশ সুন্দর পরিবেশ। প্রবেশমূল্য দু' টাকা। কুড়ি একর জমির ওপর স্থাপিত রাজবাড়ির মধ্যে দুটি বড় দীঘি। দেখে মনে হল প্রচুর মাছ। বিকালে মাছগুলো বেশ খেলা করছিল।

যাওয়া-আসার পথে সীমান্তে দেখলাম বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় প্রবেশ করার অপেক্ষায় দুই শতাধিক পণ্যবোঝাই ট্রাক। এসব ট্রাকে রড, সিমেন্ট, ইট, বালু, খোয়া ইত্যাদি নির্মাণসামগ্রী। রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশের মিঠা পানির এবং সামুদ্রিক মাছ। কাভার্ড ভ্যান ভরে যাচ্ছে আসবাবপত্র। ওপার থেকে আসছে সামান্যই। ২৫ মে ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব জামাইষষ্ঠি। রাজবাড়ির সামনে বটতলা বাজারে বড় বড় ইলিশ মাছ বিক্রি হচ্ছে। ভারতীয় মুদ্রায় দু'কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছিল বারোশো টাকা কেজি দরে।

বাংলাদেশের এক চতুর্থাংশ আয়তনের ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যা মাত্র ৩৯ লাখ। জনসংখ্যার অর্ধেক নানা উপজাতীয় গোষ্ঠী। তবে বাংলাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রায় ২৪ বছর একনাগাড়ে বাম ফ্রন্ট ক্ষমতায়। মুখ্যমন্ত্রী মাণিক সরকার বেশ জনপ্রিয়। ভারতের সবচেয়ে দরিদ্র মুখ্যমন্ত্রী। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। ত্রিপুরার সমতল ভূমিতে ধান-গম উৎপন্ন হয়। পাহাড়ে জন্মে মশলা এবং ফল। ত্রিপুরার আবহাওয়া বাংলাদেশের মতই।

হাবিবুর রহমান স্বপন সংবাদিক, লেখক

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে

আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইতোমধ্যে ভারত বিচিত্রার অনলাইন এডিশনের সুবিধা চালু হয়ে গেছে এবং আপনারা অনলাইনে ভারত বিচিত্রা পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও ফেসবুকে সংযুক্ত হতে পারেন। এই মুহূর্তে পত্রিকাটির নতুন গ্রাহকদের নাম-ঠিকানা অন্তর্ভুক্তির কাজ চলছে। ভারত বিচিত্রার পুরনো ও নতুন গ্রাহক-পাঠকদের অনেকেরই টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর/ ই-মেইল আইডি আমাদের কাছে নেই। যাঁরা নিয়মিত ভারত বিচিত্রা পড়তে ইচ্ছুক, এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অবিলম্বে নতুন গ্রাহক হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে নাম, পদমর্যাদা (যদি থাকে), পূর্ণ ঠিকানা, টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল আইডি (যদি থাকে) উল্লেখ করে সম্পাদক বরাবর চিঠি লিখে পাঠান। সবাইকে ভারত বিচিত্রার সঙ্গে সব সময় সংযুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই সংশোধিত নতুন তালিকা প্রস্তুতির এ আয়োজন।

ভারত বিচিত্রার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি, এর প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং একে আরও প্রাঞ্জল রূপ দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আপনাদের প্রিয় পত্রিকায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার কপি রেখে এবং ঠিকানা নির্ভুলভাবে লিখে পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ৬ মাসের মধ্যে মুদ্রিত না হলে বুঝতে হবে লেখা অমনোনীত হয়েছে। এ ব্যাপারে যে কোন
ধরনের যোগাযোগ লেখকের অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

– সম্পাদক

ছোটগল্প

অপেক্ষা

মঞ্জু সরকার

লাঠিতে ভর দিয়ে রোগভারে জীর্ণ শরীরটা টেনেহিঁচড়ে রোজ ঠ্যাংভাঙা ঘাটে আসে আইনুদ্দি। তিস্তার পুরান চরে তার বাড়ি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মরা নদীর বালুচর ও খেত-প্রান্তরের মাঝ দিয়ে মাইলখানেক উঁচু-নিচু পথ ভাঙতে হয়। কোমরে দু'মণ ওজনের চেয়েও ভারী ব্যথা অনুভূত হলে, বাঁকা কোমর নিয়ে হাঁটতেও পারে না। মাটিতে বসে পড়ে খানিক জিরায়, উঠে দাঁড়িয়ে আবার ঠুক্‌ঠুক হাঁটে। চাকাবিহীন এক লাঠিতে প্রায় আশি বছরের পুরনো শরীর টেনে এতটা পথভাঙা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। তারপরও আইনুদ্দি বুড়োর রোজ আসা চাই ঠ্যাংভাঙা ঘাটে।

ঘাট বলতে যা বোঝায়, নদী-খেয়া নৌকা সে-সব কিছুই নেই এখন। তবু আদি নাম ও ঐতিহ্য ধরে রেখেছে জায়গাটা। নদী মরে গেলেও উল্টোদিকের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটা পাকা হয়েছে ঘাট পর্যন্ত। পাকা রাস্তার মাথায় তিনটি স্থায়ী দোকানসহ ছোটখাটো বাজার গড়ে উঠেছে। একদা ঠ্যাংভাঙা ঘাটের নিচে নদীতে যেমন নৌকা চলত, এখন তেমনি কালো পিচের রাস্তাটায় স্রোতের মতই মানুষ ও মেলা যানবাহন চলে।

আশপাশ গ্রামের লোকজন পাকা রাস্তা ধরে ঠ্যাংভাঙা হাট কি দূর-দূরান্তের নানা গন্তব্যে ছুটে যায়। কিন্তু আইনুদ্দির গন্তব্য ঘাট অবধিই। রোজ ঘাটে এসে খাজা ডাকাতের দোকানের বেঞ্চিতে বসে থাকে দিনমান। রাস্তার ধারে একা বসে থাকলে অচেনা পথচারীরা বুড়োকে অসহায় ভিখিরি ভাবতে পারত। কিন্তু কারো কাছেই হাত পাতে না বুড়ো। বরং গর্বের সঙ্গে নিজের পুরনো পরিচয় তুলে ধরতে হারানো দিনের গল্প শোনায়। আইনুদ্দি বুড়োর অসংলগ্ন আত্মকাহন কিংবা মরার মত চুপচাপ থাকাটা দোকানে উপস্থিত ভিড়ের মাঝে নানা কৌতুক ও কৌতূহল জাগায়।

দোকান ফেলে খাজা ডাকাতও অনেক সময় যোগ দেয় আইনুদ্দিবিষয়ক সরস আলোচনায়। ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে খাজা দোকান দেওয়ার পরও নামের অবিচ্ছেদ্য ডাকাত উপাধি ঘোচাতে পারেনি। ফলে সাইনবোর্ড ছাড়াই দোকানটা সবার কাছে ডাকাতের দোকান হিসেবে পরিচিত। পাকা রাস্তার পথচারী, রিক্‌শা-ভ্যান-ভটভটির ড্রাইভার ছাড়াও গাঁয়ের নিয়মিত খদ্দের ও অলস আড্ডাবাজরা দিনেরাতে ভিড় জমায় দোকানে। ভিড় বাড়াতে দোকানের প্রশস্ত বারান্দায় তিনটি বাঁশের বেঞ্চি পেতে দিয়েছে খাজা। রঙিন টিভিও ফিট করেছে দোকানে। লেখাপড়া শিখিয়েও যুবতী মেয়েকে বিয়ে দিতে পারে না। জেলখাটা দাগী আসামীর মেয়েকে কে করবে বিয়ে? দোকান চালানোর দায়িত্ব দিয়েছে তাই যুবতী মেয়েকে। দোকানে সাজানো নিত্য প্রয়োজনীয় ও হরেকরকম মনোহারী দ্রব্যের পাশে ডাকাতকন্যা দুলালীও এখন অনেকের দৃষ্টিতে মালবিশেষ। চায়ের কাপে দুধ-চিনি মেশাতে চামচ নাচিয়ে দুলালীর চা বানানো, দু'হাতের ছোঁয়ায় পানের খিলি বানানো এবং তার দোকানদারির দক্ষতাও ডাকাতের দোকানে বেচাবিক্রি বাড়ার বড় কারণ। এমন প্রশংসা দুলালীকে শুনিয়েও করে পরিচিত খদ্দেররা।

দোকানের বেচাকেনা ভিড়ের মাঝে আইনুদ্দি বুড়োর একটানা উপস্থিতি বেখাপ্পা অবশ্যই। নগদে বা বাকিতে কিছুই কেনে না সে। অন্যদের মত চা-পান-সিগারেটেও আসক্তি নেই তেমন। দোকানের বেঞ্চিতে পা তুলে বসে একটা বাঁশের খুটিতে হেলান দিয়ে চুপচাপ বেচাকেনা দেখে, লোকজনের গল্পগুজব শোনে, টিভিতেও চোখ রাখে কখনো-বা। নিজের কথায় ব্যস্ত ভিড়কে টানতে পারে না বলে, প্রায় সময়ই চোখ বুজে ঝিমোয় এবং সত্যি সত্যি ঘুমিয়েও পড়ে বুঝি।

আইনুদ্দিকে যারা চেনে, ডাকাতের দোকানে দিনমান বসে থাকার গূঢ় কারণটাও তারা অনুমান করতে পারে সহজে। লোকজনের নানারকম অনুমান ও জানাশোনার অভিজ্ঞতায় আইনুদ্দি বুড়োর উপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যাও আড্ডায় সরস আলোচনার খোরাক হয়ে ওঠে অনেক সময়। কারো মতে, নাতনি সম্পর্কের দুলালীকে পাহারা দেওয়ার জন্যই লাঠি হাতে দোকানে এসে বসে থাকে বুড়ো। খাজা ডাকাতই এ দায়িত্ব দিয়েছে তাকে। কিন্তু যে লোক লাঠির সাহায্যে নিজেকেও খাড়া রাখতে পারে না, চোখ মেলে তাকাবার তাগদ পর্যন্ত যার নেই, সে পাহারাদারির দায়িত্ব আর কী পালন করবে? কেউ-বা বলে, একদা খাজার ডাকাতদলের সদস্য ছিল চরুয়া আইনুদ্দিও। নদীতে নাও ভাসিয়ে ডাকাতি করতে যেত। পুরানা দিনের প্যাচাল শোনাতেই ডাকাতের দোকানে এসে বসে থাকে লোকটা। কেউ-বা বলে, আসল কারণটা হল, ডাকাতের দোকানের প্রধান উপদেষ্টা সে। নিজেও দীর্ঘকাল দোকানদারি করেছে আইনুদ্দি। দোকান কীভাবে চালাতে হয়, কীভাবে খদ্দের ঠকিয়ে লাভের অংক বাড়াতে হয়, দুলালীকে সেই কৌশল শেখাতেই দোকানে বসে থাকে আইনুদ্দি।

নিজের সম্পর্কে লোকজনের কৌতূহলী আলোচনা, এমনকি নিন্দা-মন্দ শুনলেও খুশি হয় আইনুদ্দি। নড়েচড়ে বসে পুরনো দিনের গল্প শোনাতে চায়। কিন্তু স্মৃতির ভেলায় চেপে বুড়োর গল্প খেই হারিয়ে এতটা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যে, ধৈর্য রাখতে পারে না শ্রোতারা। বুড়োকে এড়াতে ব্যস্ত লোকজন নিজেদের কেনাকাটা, গল্পগুজব কি টিভি দেখায় মনোযোগ দেয়। তখন চোখ বুজে বিড়বিড় করে নিজের গল্প নিজেকেই শোনায় আইনুদ্দি।

হ্যাঁ কথা সত্য, ঠ্যাংভাঙা ঘাটে যখন নদী ছিল, আইনুদ্দির বাপ ছিল তফের ঘাটিয়ালের এক নম্বর মাঝি। মাঝি বাপের সঙ্গে কৈশোরে নাও চালিয়েছে আইনুদ্দি। কিন্তু নদী মরে যাওয়ায় সে-সব পরিচয় কে আর মনে রাখবে? তবে আইনুদ্দি দোকানদারকে পাঁচগাঁয়ের বয়স্ক লোক সবাই চেনে। সামান্য বিড়ির দোকান দিয়ে শুরু করে এ তল্লাটের নামকরা এক মনিহারি দোকানের মালিক হয়ে উঠেছিল সে। আজকের মত পাকা রাস্তা-কারেন্ট-টিভি-মোবাইল ছিল না, গ্রাম তখন চিরকালীন গ্রামের মতই শান্ত। ঠ্যাংভাঙা হাট ছাড়া গালামাল কি মনিহারি দোকান নেই একটাও। সেই আমলে কাঁধে দোকান নিয়ে আইনুদ্দি ঘাট পেরিয়ে ডাঙার গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। বাঁশের বাঁকের দু'দিকে দড়িবাঁধা দু'টি মস্ত ডালা। ডালায় দোকানের মাল। মেয়েদের আলতা-চুড়ি, কদুর তেল, পাঁচশো সত্তর সাবান ইত্যাদি দামি জিনিসগুলি রাখে টিনের স্যুটকেসের ভিতর। তেল-নুন ছাড়াও চাহিদা বুঝে নানারকম মৌসুমি মাল রাখে অন্য ভারটিতে। আজকাল ভ্যানগাড়িতে কত রকম পণ্য সাজিয়ে পাকা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় ফেরিওয়ালারা। মাইকে গান কি লেকচার বাজিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ক্রেতাদের। কিন্তু আইনুদ্দি দোকান নিয়ে গাঁয়ের চেনা গেরস্ত বাড়িতে যায় আত্মীয়স্বজনদের মত। গেরস্ত ঘরের বউ-বাচ্চারাই তার প্রধান খদ্দের। বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়ে ও ভাবী, ও চাচি, ও ময়নার মা, দেখ আসিয়া, কী জিনিস আনছি আজ গো টাউন থাইকা! আইনুদ্দির হাঁকডাকের জাদুতে জড়ো হয় বাড়ির বউঝিয়ের দল। স্যুটকেসের মন ভোলানো হরেক মাল মেলে ধরলে লোভ সামলাতে পারে না অনেকেই। আজকাল যেমন গরিব কামলার ঘরেও নগদ টাকাপয়সার ঝনঝনানি, সেই আমলে বড় বড় গেরস্তবাড়ির বউবিবিরাও নগদ টাকা-পয়সার মুখ দেখত না। আইনুদ্দির খদ্দেররা মাচানের ধান কিংবা চুরি করা পাটের গোছা দিয়েই জিনিসপত্র কেনে। এ কারণে ধান কাটা-মাড়াই মৌসুমে জমে ওঠে তার ব্যবসা। সারাদিন দোকানদারি করে দোকানের মালপত্রের সঙ্গে ডালায় রোজ দুই-আড়াই মণ ধান নিয়ে ঘরে ফেরে। এখন লাঠিতে ভর দিয়েও দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু বয়সকালে দুই- তিন মণ ভার কাঁধে নিয়ে হাত দুলিয়ে পাঁচ-সাত মাইল পথ হনহনিয়ে হেঁটে যেত অনায়াসে।

আইনুদ্দির নিজের আবাদ নেই, খেতের কামও করে না, কিন্তু তার ডালায় রোজ এত এত ধান দেখে সহ্য হয় না গাঁয়ের বহু গেরস্তচাষীর। বাড়িতে তার উপস্থিতি দেখলে কুকুর তাড়ানো মেজাজ দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয় অনেকে। আবার রাস্তা থেকেও দোকানদারকে ডেকে নিয়ে যায় বাড়িতে কেউ-বা।

আজকের এই দোকানদারনি দুলালীও এইটুকুন বয়সে ঘাটে আইনুদ্দির দোকান দেখলে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেছে কতবার। খাজা তখন জেলে, খাজার বউ কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালায়। কেনার মত ধান-চাল কিছুই থাকে না ঘরে। তবু খাজার বউ চাইলে বাকিতেও এটা-ওটা জিনিস দিতে কোনদিন না করে না আইনুদ্দি। তো একবার হয়েছে কি, বাড়িতে আইনুদ্দিকে দেখেই খাজার বাপ লাঠি নিয়ে বেরয়। তার অপরাধ? ডাকাতের বাড়িতে দিনদুপুরে ডাকাতি করতে গেছে আইনুদ্দি। ডাকাত ছেলের চেয়েও বড় রাগী আর নামকরা লাঠিয়াল ছিল মানুষটা। দোকান কাঁধে নিয়েই ভোঁ দৌড় দিয়ে এক ছুটে চরে পালিয়ে যায় আইনুদ্দি।

আইনুদ্দির গল্পের সত্যতা যাচাই করতে দোকানদারির ফাঁকে দুলালীও জানতে চায়, ও দাদা, কোন সময়ের গল্প কন? স্বাধীনতার আগের, না পরের কথা?

এইটা স্বাধীনতার আগের ঘটনা।

কিন্তু আব্বা তো ডাকাতি মামলায় জেলে গেছে দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক পরে, ঊনিশশো চুরাশি সালে। আর আমার দাদা মরেছে স্বাধীন হওয়ার আগে।

সময়ের হিসাব বড় তালগোল পাকিয়ে যায়। স্মৃতির জট খুলতে জানতে চায়, তা হইলে সাঁঝের বেলায় যে এই ঘাটে একদিন আমার দোকান-তবিল সব কাইড়া নিল, সেইটা কোন সময়?

বুড়োর আত্মকাহনে বিরক্ত শ্রোতারা তাকে এড়াতেই নিজেদের কেনাকাটা কিংবা টিভির অনুষ্ঠান দেখায় মগ্ন হয়। দুলালীও দোকানদারি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ভিড়ের সঙ্গে সংযোগ হারালে আবারও একা হয় আইনুদ্দি। তখন চোখে বুজে স্মৃতির ভেলায় চেপে নিজেকে নিজের গল্প শোনানো ছাড়া আর করে কী লোকটা?

স্বাধীনতার আগে না পরে দেশে ফি বছর আকাল লাগে? মঙ্গার টাইমে মানুষ খেতে পারে না, বড় গেরস্তের শূন্য ধানের গোলায় ক্ষুধার্ত ইঁদুর ছোটাছুটি করে। নগদ ধানচাল দিয়ে আইনুদ্দির মনিহারি মাল নেবে কে? ব্যবসা এবং নিজেকেও সচল রাখতে আইনুদ্দি তখন আটা ও মিষ্টি আলু ভারে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পেটের ক্ষুধায় মানুষ ঘটিবাটি দিয়ে হলেও খাবার জিনিস কেনে। একদিন গঞ্জ থেকে এক বস্তা আটা ও দোকানের কিছু জরুরি মাল কিনে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। ঘাটের কাছে পৌছতেই, ভূতের মত কয়েকজন ডাকাত ঘিরে দাঁড়ায় তাকে। তাদের একজনের হাতে রাইফেল, একজনের হাতের বড় ছুরি। আসন্ন মরণ ঠেকাতে আইনুদ্দি ভার নামায় ঘাড় থেকে। ডাকাতরা আটার বস্তা এবং কোমরে বাঁধা কাপড়ের তবিলটাও টেনে নিয়ে তিনটি সাইকেলে উঠে চম্পট দেয়ার পর হুঁশ ফেরে আইনুদ্দির। সর্বস্ব হারানোর বেদনা চিৎকার করে জানান

দেয় ঘাটে দাঁড়িয়ে। কিন্তু কেউ ছুটে আসে না। তখন নিজেই ঘাটের কাছে খাজা ডাকাতের বাড়িতে প্রথম ছুটে যায় আইনুদ্দি। খাজা তখন চরুয়া ডাকাত দলের সর্দার। এলাকার বড় বড় গেরস্ত-চেয়ারম্যানরাও ভয়ে কাঁপে খাজা ডাকাতের নাম শুনলে। রাতে বাড়িতে থাকে না ডাকাতরা। সেই রাতেও খাজা বাড়িতে ছিল না। আইনুদ্দির সর্বস্ব হারানো কান্না শুনে খাজার বউ বলে, দেশে এত যে চুরি-ডাকাতি হয়, সব কি খাজা ডাকাইত একলাই করে? তোমার দোকান ডাকাতি করে নাই সে। তবুও সন্দেহ নিয়ে পরদিন খাজা ডাকাতকেই বিচার দেয় আইনুদ্দি। খাজা বলে, আইনুদ্দি চাচা, ছিচকে চুরি-ছিনতাই আর গরিবমারা ডাকাতি আমি করি না। কে তোমার দোকান লুট করেছে, খুঁজে বের করব আমি। সাত দিন পর নগদ বায়ান্ন টাকাসহ তবিলটা উদ্ধার করে আইনুদ্দিকে ফেরত দেয় খাজা। আটার বস্তা ফেরত পায়নি। দোকান লুট করে আইনুদ্দিকে পথে বসানো ডাকাতদের পরিচয়ও জানতে পারেনি আজ পর্যন্ত। মনে পড়লে খাজাকে জিজ্ঞেস করে জানতে চায় আইনুদ্দি। বিরক্ত খাজা ধমক দেয়, পুরানা দিনের প্যাচাল বাদ দাও তো।

একদিন দুলালীকে চায়ের অর্ডার দিয়ে দোকানের বেঞ্চিতে বসার জায়গা না পেয়ে জলিল বেপারি আইনুদ্দিকে খোঁচা দিয়ে বলে, ও বাহে চরুয়া মানুষ, রোজ রোজ ডাকাইতের দোকানে আসার দরকারটা কী তোমার? বাড়িতে কি ছেলে-বউ-নাতি-নাতনিরা খাইতে দেয় না? বুড্ডা বয়সে নেড়ি কুত্তার মত ঘাটে আসিয়া পড়ি থাকার আসল কারণটা কন তো আমাকে।

জলিল বেপারির চড়া গলার প্রশ্ন শুনে আইনুদ্দিও আজ নড়েচড়ে বসে। কোমরে ব্যথা ও পেটের খিদেটা তেমন অনুভূত হয় না বলে গল্প শোনানোর আগ্রহটাও বাড়ে।

আমার লাঠি-গাড়িতে চড়িয়া রোজ ঘাটে আইসা বসি থাকি কেন শুনবা? কারণ একটাই। মরতে আহি। অহন তো নদী নাই, আজরাইল হুজুরের রথ খারাপ রাস্তা দিয়া চরে যাইতে টাইম লাগব। পাকা রাস্তা দিয়া আজরাইলের রথ তাড়াতাড়ি ছুইটা আসব। আইলেই ঝাঁপ দিয়া যমের গাড়িতে চইড়া বসুম গো! আর দেরি সইহ্য হয় না। ঠ্যাংভাঙা ঘাটেই শেষ নিকাষটা আর তোমাদের ছাইড়া রওনা দিমু।

আইনুদ্দির সরল স্বীকারোক্তি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না অনেকের। ডাকাতের দোকানে দৈনন্দিন বাঁচার উপকরণ, উত্তাপ কি বিনোদন খুঁজতে আসে যারা, তারা মৃত্যুপথযাত্রী আইনুদ্দি বুড়ার গন্তব্য নিয়ে মাথা ঘামায় না। আইনুদ্দির মরার কথা শুনে খোঁচা দিয়ে বলে একজন, মরার জন্য রোজ ঘাটে আসো দাদা! নাকি আজরাইলের ভয়ে পলায় থাকার জন্য আসো তুমি?

পালায় কি বাঁচন যাইবো রে? তোর বাপ-দাদারা কেউ বাঁইচা থাকতে পারছে? তবে শোন, পলায় থাকার একটা গল্প কই। ঠ্যাংভাঙা ঘাটে একবার সত্যই আজরাইল আইছিল। লোকেরা তারে কইত জল্লাদ বাহিনি। বাঙালিকে কচুকাটা কইরা দেশটারে তারা পাকিস্তান বানায় রাখতে চাইছিল। গণ্ডগোলের টাইম সেইটা। ও দুলালী, সেইটা না কার আমল আছিল রে?

চোখ বুজে আইনুদ্দি যে মুক্তিযুদ্ধের সময়কে স্মরণ করে, যুদ্ধ না দেখা অল্পবয়সীরাও অনুমান করতে পারে সহজে। কারণ সেই সময়ের কথা স্কুলের বইতেও লেখা আছে, টিভিতেও দেখা যায় হরহামেশা। একাত্তর সালে প্রায় এক কোটি বাঙালি পালিয়ে ইন্ডিয়া যায়। দেশে যারা ছিল, তারাও হানাদার বাহিনির ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়। ঠ্যাংভাঙা ঘাটেও একবার বড় ধরনের পালানোর ঘটনা ঘটে। কারণ রাস্তার মাথায় ঘাটেও বসেছিল রাজার ক্যাম্প। রাইফেল হাতে রাজাকাররা গ্রামে মুক্তিবাহিনি খুঁজে বেড়ায়। জয় বাংলা আর স্বাধীন বাংলার পক্ষে কথা বললেই তাদের ধরে নিয়ে পাক বাহিনির ক্যাম্পে চালান করে দেয়। পাকবাহিনির দালাল রাজাকার মারতে এক রাতে নদীর ওপার থেকে মুক্তিবাহিনি এসে রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়। ভয়ে দিগ্বিদিক পালিয়ে যায় রাজাকাররা। অপারেশন শেষ করে বিজয়ী মুক্তিবাহিনিও নদী পেরিয়ে আত্মগোপন করে। কিন্তু তার পরদিনই সন্ধ্যাবেলা খবর আসে, মুক্তিবাহিনি মারতে মেশিনগান আর কামান-ট্যাংক সাঁজোয়া বহর নিয়ে খোদ পাকবাহিনি ঠ্যাংভাঙা ঘাটের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। রাজাকাররাই খবর দিয়ে ডেকে আনে তাদের। ঠ্যাংভাঙায় আসবে বলে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রাস্তার ভাঙা পুলটাও মেরামত করেছে তারা। রাস্তার দু'পাশে বাঙালিকে দেখলেই পাখি মারার মত গুলি ছোড়ে জল্লাদরা। বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সাঁঝের মুখে অচেনা এক সাইকেল আরোহী রকেটের বেগে সাইকেল চালিয়ে ঠ্যাংভাঙা ঘাটে এসে চিৎকার করে পাকবাহিনির আসার খবরটি দেয় প্রথম। তার দেওয়া খবর শেষ হতে না হতেই স্বকর্ণে গুলির আওয়াজ শোনে ঠ্যাংভাঙার মানুষ।

ঘাটের এপারে ডাঙার পাঁচগাঁয়ের গেরস্তবাড়িতে যত মানুষ, আইনুদ্দির চেয়েও থুড়থুড়ে বুড়ো থেকে শুরু করে এক মাস বয়সী কোলের শিশু, এমন কি পেটের বাচ্চা নিয়ে মেয়েরা পর্যন্ত ঘাট পেরিয়ে অন্ধকারে নদীর চরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে পালাতে থাকে। অনেকে নৌকায় নদী পেরিয়ে ওপারেও চলে যায়। আজরাইলের খপ্পরে পড়ার জন্য মানুষের এমন আতঙ্কময় ছোটাছুটি দেখে আইনুদ্দিদের চরুয়া গাঁয়ের লোকজনও বাড়িতে থাকার সাহস পায় না। যেখানে শত্রুর সামান্য গুলির আওয়াজও ধেয়ে আসে, সেখানে স্বয়ং গুলির উৎস সশস্ত্র আজরাইল ছুটে আসতে আর কতক্ষণ? বাড়ি ছেড়ে আইনুদ্দিদের পাড়ার লোকজনও নদী পাড়ের এক মস্ত কাশবনের আড়ালে আশ্রয় নেয়।

আজরাইলের জান কবজ করা গুলির আওয়াজে বিদীর্ণ মহা আতঙ্কময় নিস্তব্ধ রাতে হঠাৎ খাজা ডাকাতের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পায় কাশবনের আড়ালে পালিয়ে থাকা মানুষগুলি। খাজা তখনও ডাকাত হয়নি, বিয়েথাও করেনি। হা-ডুডু খেলোয়াড় হিসেবে খুব নামডাক। ডাঙার ও চরের মানুষ সবাই চেনে তাকে। নিস্তব্ধ চরাচরে খাজাই প্রথম চিৎকার করে ডাক দেয়, কোনঠে পালায় গেইলেন বাহে সবাই? লাঠি-বল্লম নিয়া বারায় আইস। সবাই মিলিয়া আইজ পাকবাহিনির সাথে যুদ্ধ করব হামরা।

খাজার বেপরোয়া কণ্ঠের হাঁকডাক শুনে পালানো মানুষের ভিতরে একটু একটু করে সাহস ফিরে আসে। কাশবনের আড়াল থেকে যারা খাজার কাছে যায় প্রথম, তাদের মধ্যে আইনুদ্দিও ছিল। আইনুদ্দি দোকানদারই খাজাকে বাধা দিয়ে সতর্ক করে, মাথা খারাপ হইছে তোর, লাঠিসড়কি নিয়া আজরাইলের সামনে খাড়াইতে চাস! জল্লাদবাহিনি ঠ্যাংভাঙার সব গেরাম জ্বালাইয়া ছাই কইরা দিব। ওই শোন, গুলির আওয়াজ ক্রেমে ঘাটের কাছে ঘনায়।

লোকজনের সাড়া না পেয়ে খাজা মুক্তিবাহিনিতে যোগ দিতে চলে যায় আর গুলির আওয়াজ থেমে যাওয়ার পরও পলাতক মানুষেরা বাড়িঘর ফেলে জানটা হাতে নিয়ে অন্ধকারে নদীর চরে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে পালিয়ে থাকে। পালিয়ে আসমানের তারা দেখে আইনুদ্দিও আল্লার কাছে প্রাণভিক্ষা চায়।

জলিল বেপারিসহ দোকানের বেচাকেনার ব্যস্ত ভিড় মৃত্যুপথযাত্রী আইনুদ্দির একঘেয়ে গল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অনেক আগেই। আর পালিয়ে থাকার ক্লান্তিতেই যেন চোখ বোজে আইনুদ্দি। অতপর ভিড়ের মাঝে থেকেও একা একা স্মৃতির ভেলায় চেপে কোথায় পালিয়ে মুক্তি খোঁজে লোকটা, কেউ ফিরেও তাকায় না আর। বিড় বিড় করে এক সময় চোখ বুজে সত্যি ঘুমিয়েও পড়ে আইনুদ্দি।

দোকান নির্জন ও স্তব্ধ হওয়ার পর দুলালীই আইনুদ্দিকে জাগিয়ে দেয়, ও দাদা ওঠেন, দোকান বন্ধ করব আমি। ঘুমাইলেন নাকি?

ধড়ফড় করে বেঞ্চিতে উঠে বসে আইনুদ্দি, দোকানে পরিচিত ভিড় না দেখে দুলালীর কাছে জানতে চায়, দেশ কি স্বাধীন হইছে? মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরছে তোর বাপে?

কী আবোল-তাবোল ফেদলা পাড়েন? নেন, এই পাউরুটিটা গরম চায়ে ভিজিয়ে খান, তারপর বাড়ি যান। দোকানে আসিয়া মরার চাইতে ঘরে শুতিবসি শেষ নিশ্বাস ছাড়েন গিয়া।

দুলালীর হাতে রুটি-চা দেখে আইনুদ্দির খিদেও বেড়ে যায় যেন। কম্পিত হাতে চায়ের কাপ নেয়। চায়ে রুটি ডুবিয়ে মুখে তোলার পর, খাওয়ার তৃপ্তিতে দরদ উপচানো চোখে দুলালীর দিকে তাকিয়ে থাকে। গরম রুটি মুখগহ্বর থেকে সুড়ড়ুৎ করে পেটে নেমে গেলে, অবশিষ্ট দাঁত ক'টিতে হাসির ঝিলিক তুলে বলে আইনুদ্দি, খাজারে কইছি, তোর বিয়াটা না খাইয়া আমি মরুম না রে দুলালী!

মঞ্জু সরকার কথাসাহিত্যিক

ড. রাধাবিনোদ পাল

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিদ

আবুল ফজল পাইলট

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালি আইনবিদ ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ড. রাধাবিনোদ পাল ১৮৮৬ সালের ২৭ জানুয়ারি কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের তারাগুনিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিপিনবিহারী পাল। জাপানিদের কাছে দেবতুল্য ড. রাধাবিনোদের শৈশব কাটে মিরপুর উপজেলার সদরপুর ইউনিয়নের নিভৃতপল্লী কাকিলাদহে। এলাকাটি এখন জজপাড়া নামে পরিচিত।

রাধাবিনোদ ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন মেধাবী ছাত্র। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের ছাতিয়ান গ্রামের গোলাম রহমান পণ্ডিতের কাছে তাঁর বাল্যশিক্ষায় হাতেখড়ি। নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করে তিনি কুষ্টিয়া হাই স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তিনি মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ১৯০৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং ১৯০৫ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে ডিসটিকশনসহ এফএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা যান এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতবিভাগে ভর্তি হন।

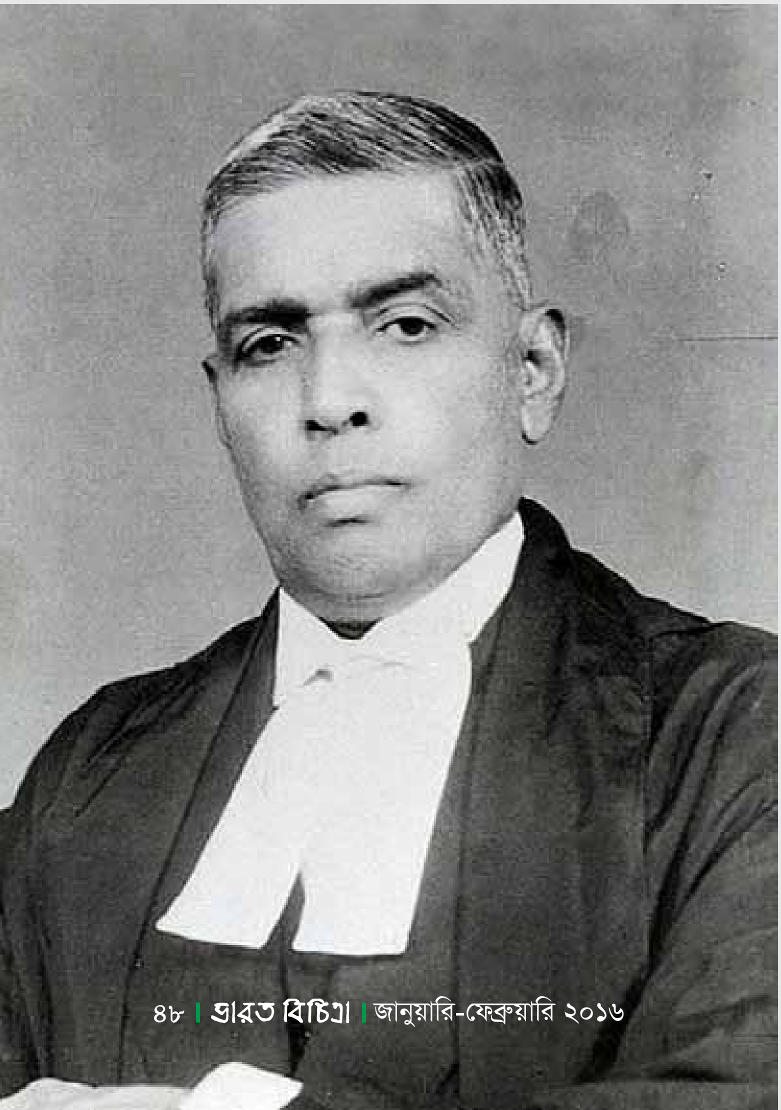

সাফল্যের সঙ্গে গণিতশিক্ষা সমাপ্ত করে রাধাবিনোদ ১৯১৯ সালে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে গণিতে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পাশাপাশি চলছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আইন বিষয়ে অধ্যয়ন। ১৯২০ সালে এলএলএম পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন পেশায় যোগদান করেন। কিছুকাল পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর ডাক আসে এবং সেখানে তিনি আইন বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। এরপর একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯২৪ সালে আইন বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৩-১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি 'ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অফ কমপেরিটিভ ল'-র যুগ্মসভাপতি এবং 'আন্তর্জাতিক আইন সমিতি'র সদস্য নির্বাচিত হন। ভারত সরকার ১৯৪১ সালে তাঁকে 'লিগ্যাল এ্যাডভাইজার' হিসেবে নিয়োগদান করেন। এবছরেই তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ পান এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষাবিদ ড. রাধাবিনোদ পালের সুখ্যাতি তখন ভারত বর্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি টোকিও ট্রায়ালে বিচারক হবার আমন্ত্রণ পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬-৪৮ সাল পর্যন্ত জাপানের রাজধানী টোকিও মহানগরে জাপানকে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করে যে বিশেষ আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত হয়, তিনি ছিলেন সেই আদালতের অন্যতম বিচারপতি। ৮০০ পৃষ্ঠার যৌক্তিক রায়ে তিনি জাপানকে 'যুদ্ধাপরাধ'-এর অভিযোগ থেকে মুক্ত করেন। এ রায় বিশ্বনন্দিত হয় এবং তিনি জাপান-বন্ধু ভারতীয় হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের 'আন্তর্জাতিক আইন কমিশন'-এর সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৪ সালে কমিশনের দ্বিতীয় ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ১৯৫৮ সালে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৬২ সালে দ্বিতীয়বারের মত কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ তাঁকে দি হেগে অবস্থিত 'আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত'-এর বিচারক পদে নিয়োগদান করেন। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং একই বছর ভারত সরকার তাঁকে ব্যবহারশাস্ত্রের জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি 'আমেরিকান সোসাইটি অফ ইন্টারন্যাশনাল ল'-র সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়াও তিনি 'ইন্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট-১৯২২' প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ড. পাল হিন্দু দর্শন আইন বৈদিক যুগ, তামাদি আইন, আয়কর আইন, পূর্বাধিকার আইন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়ন এবং বৈদিক যুগ হিন্দু আইন ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন। তিনি জাপান, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আইনবিষয়ক আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং সভাপতিত্ব করেন। তিনি আইন-সম্পর্কিত বহু গ্রন্থপ্রণেতা।

জাপানের ইতিহাসে রাধাবিনোদ পালের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। টোকিও শহরে তাঁর নামে রয়েছে রাস্তা, মনুমেন্ট, জাদুঘরসহ অসংখ্য স্থাপনা। এমনকি জাপান বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে একটি রিসার্চ সেন্টার রয়েছে।

চাকরিজীবনের খ্যাতি ও সুনাম তাঁকে বিশ্বপরিচয় দান করেছে। তিনি ছিলেন নয় কন্যাসন্তান (যথাক্রমে শান্তি, আশা, লীলা, বেলা, নীলিমা, রুমা, রেণুকণা, লক্ষ্মী এবং স্মৃতিকণা) এবং পাঁচ পুত্রসন্তান (যথাক্রমে প্রশান্ত, প্রদত্ত, প্রণব, প্রতীপবিজয় এবং প্রতুলকুমার)-এর জনক।

১৯৬৭ সালের ১০ জানুয়ারি উপমহাদেশের এই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও আইনবিশেষজ্ঞ কলকাতায় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আবুল ফজল পাইলট ব্যাংকার

১০ ডিসেম্বর ২০১৫ সন্ধ্যায় আইজিসিসি গুলশান মিলনায়তনে তিন কবির গান ও আবৃত্তি নূপুরছন্দা ঘোষ ও ড. শাহাদাত হোসেন নীপুর কণ্ঠে।

১১ ডিসেম্বর ২০১৫ সন্ধ্যায় আইজিসিসি গুলশান মিলনায়তনে তানজিনা তমার কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত

১৮ ডিসেম্বর ২০১৫ সন্ধ্যায় আইজিসিসি গুলশান মিলনায়তনে আলিফ লায়লার সেতারবাদন

১৯ ডিসেম্বর ২০১৫ আইজিসিসি গুলশান মিলনায়তনে বুলবুল মহলানবীশের একক সংগীতসন্ধ্যা

০৮ জানুয়ারি ২০১৬ সন্ধ্যায় আইজিসিসি গুলশান মিলনায়তনে ভারতের সৌমেন অধিকারীর কণ্ঠে প্রয়াত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান

০৯ জানুয়ারি ২০১৬ সন্ধ্যায় আইজিসিসি গুলশান মিলনায়তনে প্রমা অবন্তীর ওড়িশি নৃত্য পরিবেশন

১৫ জানুয়ারি ২০১৬ সন্ধ্যায় আইজিসিসি গুলশান মিলনায়তনে রোকাইয়া হাসিনা নীলির রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন

১৬ জানুয়ারি ২০১৬ সন্ধ্যায় আইজিসিসি গুলশান মিলনায়তনে ড. লীনা তাপসী খানের হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয়সংগীত ও নজরুলগীতি পরিবেশন

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra January-February 2016

सत्यमेव जयते

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা দিচ্ছে যে, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুরে নতুন আইভিএসি খোলা হয়েছে।

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।

ঠিকানা

আইভিএসি-র সব কেন্দ্র সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখ নিম্লোক্ত আইভিএসি কেন্দ্রে বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা ॥ আইভিএসি, উত্তরা, ঢাকা ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট ॥ আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী ॥ আইভিএসি, বরিশাল ॥ নর্থ সিটি সুপার মার্কেট দ্বিতীয় তলা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, অমৃতলাল দে রোড, বরিশাল (এলাকাধ বরিশাল, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর) ॥ আইভিএসি, ময়মনসিংহ, ২৯৭/১ মাসকান্দা দ্বিতীয় তলা, মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড, ময়মনসিংহ (এলাকা: জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, টাঙ্গাইল ও ভালুকা) ॥ আইভিএসি, রংপুর, জে বি সেন রোড, রামকৃষ্ণ মিশনের বিপরীতে, মহিগঞ্জ, রংপুর (এলাকা: রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এবং লালমনিরহাট)। উল্লেখ্য, এসব এলাকার ভিসা আবেদন ঢাকার কোন কেন্দ্রে গ্রহণ করা হবে না।

ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্লোক্ত হারে কার্যকর হবে: ১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০। ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৬. আইভিএসি, বরিশাল– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ৭. আইভিএসি, ময়মনসিংহ– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রংপুর– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে বিশেষভাবে কার্যকর, আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯ ০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত